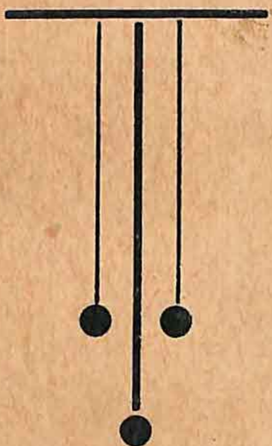
বিজ্ঞান-আলোচনা

প্রথম ভাগ



বসু ও ঘোষ

বিজ্ঞান-আলোচনা

প্রথম ভাগ

[উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বসু এম, এ

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

ও

শ্রীসুদেব ভূষণ ঘোষ, এম্, এস-সি,

জীব বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক,
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ও
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির,
বেলুড়

প্রথম সংস্করণ

ঘোষ এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীসুকৃতি ভূষণ ঘোষ, বি, কম্
ঘোষ এণ্ড কোং
১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—
শ্রীফকির চন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

যে কতিপয় উদ্যোক্তা আমাদের মাতৃভাষা-বাংলায় প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আমার পরমারাধ্য মাতামহ স্বর্গীয় আচার্য্য গিরিশ চন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম। তাঁহার নিকট হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা করিবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারই রচিত যে "বিজ্ঞান আলোচনা" বহুকাল যাবৎ শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে সেই "বিজ্ঞান-আলোচনা" অবলম্বনেই এই পুস্তকখানি রচিত হইল।

উচ্চতর মাধ্যমিক ও সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে আচার্য্যদেবের "বিজ্ঞান-আলোচনা"র সঙ্কোচন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্তন সাধন করিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক নির্দেশিত জ্ঞাতব্য বিজ্ঞান যাহাতে ছাত্র ছাত্রীদিগের সহজ বোধ্য হয়, এই পুস্তকখানি রচনায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। পুস্তকখানি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও স্নেহের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের সমাদর লাভ করিলে সুখী হইব।

দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী প্রকাশিত হইলে উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের উপযোগী বিজ্ঞান পুস্তক ও প্রণীত হইবে।

কলিকাতা
১লা আগষ্ট
১৯৫৭ সাল।

সুদেব ভূষণ ঘোষ

সূচীপত্র

বিজ্ঞান-আলোচনা

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বায়ু

বায়ুর উপাদান—বায়ু প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটি মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণে গঠিত। আয়তন হিসাবে বায়ুতে প্রায় একভাগ অক্সিজেন ও চারিভাগ নাইট্রোজেন আছে। একশত আয়তন **বায়ুতে ২১ আয়তন অক্সিজেন ও ৭৯ আয়তন নাইট্রোজেন** এবং ওজন অনুপাতে বায়ুর **শতকরা ২৩ ভাগ অক্সিজেন ও ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন**। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়াও বায়ুতে স্বল্প পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প, আর্গন, ক্রিপ্টন, হিলিয়াম, নিওন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ মিশিয়া আছে। যৌগিক পদার্থে উহার উপাদানগুলি এক একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে, ইহাই নিয়ম। বায়ু একটি মিশ্রণ বলিয়াই উহার উপাদানসমূহের

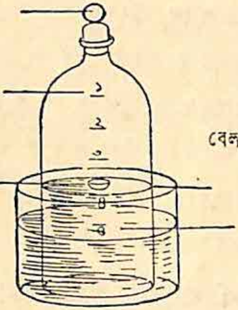
অনুপাত সর্বত্র এবং সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। তথাপি আয়তন হিসাবে উহার উপাদানগুলির মোটামুটি অনুপাত এইরূপ—

নাইট্রোজেন	প্রতি	শত	ভাগে	৭৭'১৬	ভাগ
অক্সিজেন	,,	,,	,,	২০'৬০	,,
জলীয় বাষ্প	,,	,,	,,	১'৪০	,,
কার্বন ডাই-অক্সাইড	,,	,,	,,	০'০৪	,,
নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ	,,	,,	,,	০'৮০	,,
			মোট—	১০০'০০	,,

বায়ুর উপাদানগুলির অস্তিত্বের পরীক্ষা

(১) বেলজার ও ফসফরাস দ্বারা পরীক্ষা— একটি ছোট হালকা পাত্রে (crucible) একটু ফসফরাস লইয়া ঐ পাত্রটি একটি জলপূর্ণ পাত্রে ভাসাইয়া রাখ। এখন একটি বেলজার (bell jar), ছিপি খুলিয়া ঐ জলপূর্ণ পাত্রটির উপর এমনভাবে বসাও যেন ভাসমান পাত্রটি বেলজারের মধ্যে থাকে। প্রথমে দেখিবে, ছিপি খোলা অবস্থায় বেলজারের ভিতরে ও বাহিরে জল সমতলে আছে। এখন বেলজারের উপরের মুখ দিয়া একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া ফসফরাসের টুকরাটি জ্বালাইয়া দাও এবং শীঘ্র কাঠিটি বাহির করিয়া জারের মুখ ছিপি দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ কর। দেখা যাইবে, ফসফরাস নিভিয়া যাইবার পর জারের মধ্যে জল উপরের দিকে ধীরে ধীরে উঠিতেছে অর্থাৎ জারের মধ্যস্থ জলের উপর-তল বাহিরের জলের উপর-তল অপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। জারের মধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেন ফসফরাসের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে এবং ফসফরাস পেণ্টাক্সাইড নামক গ্যাস উৎপন্ন করিয়াছে, ঐ গ্যাস জলে দ্রবীভূত হওয়ার ফলে অক্সিজেনের স্থান শূন্য হইয়াছে এবং জল সেই শূন্য স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণ

জল জারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাই হইল জারের মধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেনের আয়তন (volume)। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জল



বেলজারের ভিতর যতখানি খালি স্থান অধিকার করিয়াছে উহা সমগ্র জারের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র এবং বাকী ৪ ভাগ খালি রহিয়াছে।

বেলজারের মধ্যে আবার একটি প্রজ্বলিত কাঠি প্রবেশ করাও; দেখিবে **উহা** নিভিয়া যাইবে। একটি জীবন্ত মাছি ঢুকাইয়া দিলে উহাও অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যাইবে। সুতরাং দহনের পর জারের মধ্যে যে গ্যাস অবশিষ্ট থাকে তাহাতে কোন বস্তুই জ্বলিতে পারে না এবং কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। তবেই দেখা গেল, বায়ুতে অন্ততঃ দুইটি গ্যাস আছে। একটি দহনের সহায় এবং বায়ুর $\frac{১}{৫}$ অংশ অধিকার করিয়া থাকে, উহার নাম **অক্সিজেন**; এবং অপরটি দহনের প্রতিবন্ধক এবং বায়ুর $\frac{৪}{৫}$ অংশ অধিকার করিয়া থাকে, উহার নাম **নাইট্রোজেন**। উহাই জারের মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

(২) জলের উপর আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে বাতি প্রজ্বলন—একটি পাত্রে প্রজ্বলিত মোমবাতি বসাইয়া পাত্রে কিছু জল ঢাল এবং ঠিক পূর্বের মত একটি বেলজার দিয়া বাতিটিকে ঢাকা দাও। এখন জলের উপর-তল ভিতরে ও বাহিরে সমান। বেলজারের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ কর। দেখিবে, বাতি ক্রমে নিভিয়া যাইবে এবং বেলজারের

ভিতরের জলের উপর-তল বাহিরের জলের উপর-তল অপেক্ষা উচ্চ হইবে। এক্ষেত্রে বায়ুর অক্সিজেন মোমবাতির অঙ্গারের (কার্বন) সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করিয়াছে—ইহা জলে দ্রব হয়। কাজেই যে অক্সিজেন ব্যয় হইল সেই পরিমিত জল জারের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখানেও দেখিতে পাইবে, পূর্বের আয়তনের $\frac{8}{5}$ অংশ গ্যাস অবশিষ্ট আছে। উহা নাইট্রোজেন। উহার মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখিবে যে কাঠিটি নিভিয়া গেল অর্থাৎ উহা দহনের সহায়ক নহে।

(৩) লৌহচূর্ণ দ্বারা পরীক্ষা—একটি ছোট পাত্রে কয়েকটি চকচকে লোহার টুকরা লইয়া পাত্রটি জলে ভাসাইয়া দাও এবং উহার উপর একটি বেলজার চাপা দাও। এখন ভিতর ও বাহিরের জল সমতলে আছে। জারের মধ্যস্থ বায়ুর আয়তন মাপিয়া লও এবং জারের উপরের মুখ ছিপি বন্ধ করিয়া, উহাকে ঠিক এইভাবে কিছুদিন রাখিয়া দাও। কিছুদিন পরে দেখিবে জারের মধ্যের জল বাহিরের জল অপেক্ষা অল্প উচ্চ হইয়াছে এবং লোহার উপর লাল বর্ণের মরিচা ধরিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় জারের মধ্যে যে গ্যাস অবশিষ্ট আছে উহা নাইট্রোজেন এবং উহার আয়তন বায়ুর $\frac{8}{5}$ অংশ। বায়ুর অক্সিজেন ধীরে ধীরে লৌহের সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইড অব্ আয়রন নামে একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাকেই সাধারণতঃ লৌহে মরিচা ধরা বলে। এখন বেলজারের ভিতর একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দেখিতে পার যে কাঠিটি নিভিয়া গেল অর্থাৎ উহা দহনের সহায়ক নহে, অতএব উহা নাইট্রোজেন। এই পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে বায়ুর $\frac{8}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন এবং $\frac{5}{5}$ অংশ অক্সিজেন।

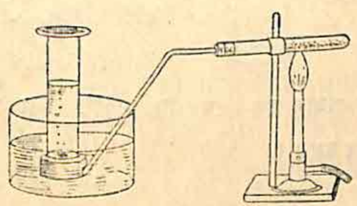
(৪) চুনের জল দ্বারা পরীক্ষা—একটি ডিশে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল লইয়া কিছুক্ষণ বাহিরের খোলা বাতাসে রাখ, দেখিবে

কিছু সময় পরে চুনের জল আস্তে আস্তে ঘোলা হইয়া গিয়াছে এবং উহার উপরে একটা সাদা সর পড়িয়াছে। ঐ সাদা সরের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। চুনের জলের সহিত যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলেই চুনের জল ঐরূপ ঘোলা হয়, অতএব বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে উহাই ডিশের চুনের জলকে ঘোলা করিল।

অক্সিজেন

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী—পটাসিয়াম ক্লোরেট (Potassium Chlorate)—নামক এক প্রকার সাদা পদার্থ উত্তপ্ত করিয়া সাধারণতঃ এই গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। পটাসিয়াম ক্লোরেট বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া, উহার সহিত কিছু পরিমাণে **ম্যাঙ্গানিজ**

গ্যাস-জারের মধ্যে গ্যাস জমিতেছে, জলপাত্রে জল আছে, তাহার উপর জলপূর্ণ গ্যাস-জার উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে

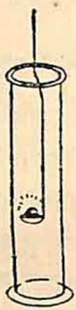


অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

ডাই-অক্সাইড (manganese di-oxide) নামক কৃষ্ণবর্ণ একটি পদার্থ মিশাও। এই মিশ্র পদার্থ একটি পরীক্ষা-নলে (test-tube) লইয়া উহার মুখে একটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক পরাও এবং ছিদ্রের মধ্যে একটি বাঁকা কাচের নল প্রবেশ করাইয়া, নলের অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া রাখ। এইবার বার্ণার (burner) বা স্পিরিট ল্যাম্পের দ্বারা পরীক্ষা-নলটি উত্তপ্ত কর। দেখিবে, জলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বাহির হইতেছে। যেখানে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে ঐ স্থানে একটি জলপূর্ণ

গ্যাস-জার উপুড় করিয়া ধর। দেখিবে, জারের মধ্যে গ্যাস জমিবে ও জারের জল বাহির হইয়া আসিবে। এখন গ্যাসপূর্ণ জারটির মুখ ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া টেবিলের উপরে বসাও। এইভাবে কয়েকটি জার অক্সিজেন গ্যাসে পূর্ণ কর।

অক্সিজেনের পরীক্ষা (Test)—একটি পাটকাঠিতে আগুন ধরাইয়া ফুৎকার দিয়া শিখাটি নিভাইয়া দাও এবং নিভাইয়া দিলে ঐ কাঠির মুখে যে আগুন থাকে, সেই আগুনযুক্ত কাঠিটি উপরিকথিত অক্সিজেন-পূর্ণ জারের মুখের ঢাকনি খুলিয়া উহার মধ্যে ধর। দেখিবে, কাঠিটি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপ একটুকরা জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা বা প্রজ্বলিত **গন্ধক** অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে ধরিলে, ঐ দুইটি বস্তুই তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে (চিত্রে দেখ)। এই সকল পরীক্ষায় প্রমাণ হয়—যে বস্তু বায়ুতে অল্প অল্প জ্বলে, অক্সিজেনে তাহা তীব্রভাবে জ্বলে।

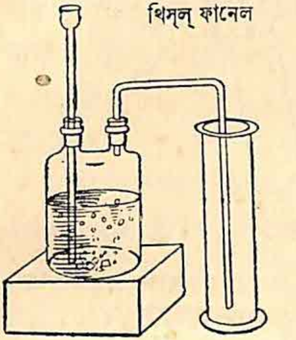


অক্সিজেন গ্যাসে দীপ্ত কাঠ-কয়লা তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল

কার্বন ডাই-অক্সাইড

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী—দুই-মুখ-বিশিষ্ট একটি বোতলে কিছু মার্বেল পাথরের টুকরা লও। বোতলের একটি মুখে লম্বা-নল-বিশিষ্ট একটি **থিস্‌ল্ ফানেল** (thistle funnel) পরাও। ঐ ফানেলের নল যেন বোতলের তলদেশ স্পর্শ করে। অপর মুখে একটি বাঁকা কাচের নল পরাও। এইবার ফানেলের মধ্যে কিছু জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখিবে, সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া [illegible]। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বোতলের মুখে যে বাঁকা কাচের

নল আছে, তাহা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। উহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটি গ্যাস-জার টেবিলের উপর সোজা করিয়া বসাও এবং বাঁকা কাচের নলটি গ্যাস-জারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। কিছুক্ষণ পরেই ঐ জার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পূর্ণ হইবে। এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা



মার্বেল পাথরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হইয়াছে

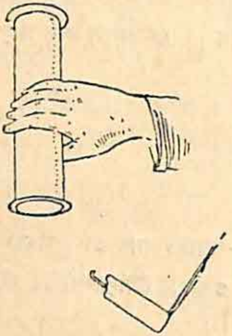
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভারী বলিয়া নীচে নামিতেছে ও বাতাস ঊর্ধ্বমুখে বাহির হইতেছে

ভারী। সুতরাং জারের মধ্যে যখন বাঁকা নলটি প্রবেশ করানো হইল, তখন ভারী বলিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নীচের দিকে নামিয়া গ্যাস-জারটিকে পূর্ণ করিল এবং বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া ঊর্ধ্বপথে বাহিরে চলিয়া গেল।

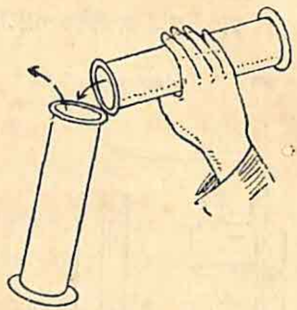
পরীক্ষা (Test)—(১) একটু পরিষ্কার চুনের জল এক জার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে ঢাল। দেখিবে, চুনের জল খড়ি-গোলা জলের মত সাদা হইয়াছে। মনে রাখিবে, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ইহাই বিশেষ পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা দ্বারা অন্যান্য গ্যাস হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়।

(২) একটি মোমবাতি জালাইয়া (৮ পৃষ্ঠার বাঁদিকের চিত্র দেখ) একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসপূর্ণ জার বাতির শিখার উপর কাত করিয়া

ধর। দেখিবে, বাতি নিভিয়া যাইবে। অতএব প্রমাণ হইল যে, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে জ্বলন্ত শিখা নিভিয়া যায়। গ্যাসটিও দাহ্য বস্তু নহে।



কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নিভিয়া গেল



গ্যাস-জারের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঢালা হইতেছে

(৩) আর একটি খালি গ্যাস-জারের মুখের কাছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসপূর্ণ একটি জার কাত করিয়া ধর (উপরের ডান দিকের চিত্র দেখ) এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ খালি গ্যাস-জারের মধ্যে চুনের জল দিয়া নাড়িতে থাক; দেখিবে, চুনের জল সাদা হইয়া গিয়াছে। উহাতে পূর্বে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল না, তবে আসিল কিরূপে? নিশ্চয়ই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের জার কাত করিয়া ধরার জন্য। দেখিলে, যেমন এক গ্লাসের জল অপর গ্লাসে ঢালিতে হয়, ঠিক সেইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও একপাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালা যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়াই এইভাবে ঢালা সম্ভব হইল।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার ও উপকারিতা—সোডা বা লেমনেড জল প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কাপড়-কাচা সাবান প্রস্তুতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অগ্নিনির্বাপক কার্যেও ইহার ব্যবহার আছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে খুব সহজেই

তরল (liquid carbon di-oxide) আকারে পরিণত করা যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে খুব বেশী চাপে কোন পাত্রে বদ্ধ রাখিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে প্রসারণের ফলে ইহা খুব ঠাণ্ডা হইয়া বরফের ন্যায় কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরে উত্তাপ পাইলে বরফের ন্যায় গলিয়া জল হইয়া না যাইয়া একবারেই উবিয়া যায় (sublimate)। এই জমা গ্যাসকে **ড্রাই-আইস্** (Dry ice) বলে। বরফ প্রস্তুতের কার্যে ও কৃত্রিম উপায়ে কোন বস্তুর উষ্ণতা কমাইবার জন্য তরল ও কঠিন গ্যাসের ব্যবহার বাড়িতেছে।

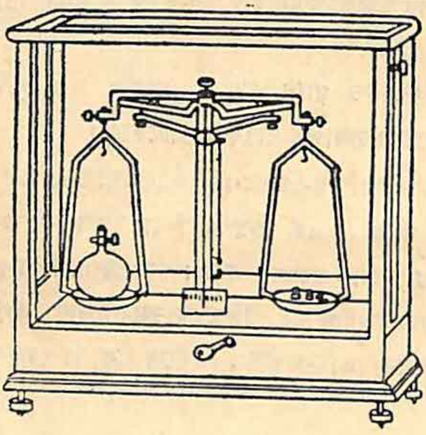
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে থাকার জন্য পৃথিবীর ত্বকের অর্থাৎ উপরের স্তরের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে।

এই গ্যাস উদ্ভিদের খাদ্য-বিশেষ। উদ্ভিদের পাতার ত্বকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র (Stoma) থাকে। এই ছিদ্রপথ দিয়া বায়ুর সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। তথায় সূর্যকিরণ, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য সবুজ অংশের ভিতরস্থ **ক্লরোফিল কণার** সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন লইয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে।

বায়ুর ওজন—বায়ুর **ওজন আছে**। অল্পপরিমাণ বায়ু এত হালকা যে উহার ওজন ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু খুব বেশী পরিমাণ বায়ুর ওজন মোটেই তুচ্ছ করা চলে না। ভূপৃষ্ঠের উপর এক ঘন-ফুট বায়ুর ওজন মাত্র তিন তোলা। আবার বিশ ফুট উচ্চ, বিশ ফুট দীর্ঘ এবং দশ ফুট প্রশস্ত এরূপ জায়গায় প্রায় চারি মণ ওজনের বায়ু থাকিতে পারে। বায়ুর যে ওজন আছে, নীচের পরীক্ষা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বায়ুর ওজনের পরীক্ষা—স্টপ কক্ বা পেঁচকলযুক্ত বড় একটি কাচের গোলক সংগ্রহ কর। বাতপাম্পের (শোষক পাম্প) সাহায্যে

গোলকটিকে বায়ুশূন্য কর। তারপর পেঁচকল দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে এই বায়ুশূন্য গোলকের ওজন লও। তুলাদণ্ডের ভারসাম্য অবস্থায় পেঁচকল ঘুরাইয়া গোলকের মুখ খুলিয়া দাও। দেখিবে, বাহিরের বায়ু সশব্দে গোলকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আর তুলাদণ্ডের যে পাল্লাটির উপর গোলক বাসন ছিল, উহা অতিরিক্ত ভারের জন্য নীচের দিকে নামিয়াছে, অর্থাৎ গোলকের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। অপর পাল্লায় উপযুক্ত



বায়ুর ওজনের পরীক্ষা

ওজন চাপাইয়া বায়ুপূর্ণ গোলকের ওজন লইলেই দেখিবে, এই ওজন পূর্বেকার বায়ুশূন্য গোলকের ওজনের চেয়ে বেশী। গোলকের নিজ ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না; অতএব দ্বিতীয়বার ওজনের বৃদ্ধিটা গোলকে যে পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিয়াছে, উহারই ওজন বলিতে হইবে। অবশ্য এই ওজন এত কম যে, খুব সূক্ষ্ম ও নির্ভুল তুলাদণ্ড দ্বারাই বাহির করা সম্ভব।

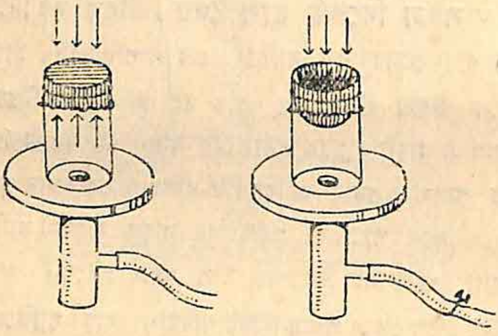
বায়ুমণ্ডলের চাপ

পৃথিবীর চতুর্দিকে যে জায়গা দখল করিয়া বায়ু আছে, উহার নাম **বায়ুমণ্ডল**। বায়ুমণ্ডলের আবার বিভিন্ন স্তর আছে। প্রত্যেক নীচেকার স্তরের বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় উপরের অন্যান্য স্তরের বায়ু অপেক্ষা ভারী। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের বায়ু পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ বায়ু পৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া আছে। যাহার ওজন আছে তাহাই অন্য জিনিসের উপর চাপ দেয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, প্রতি বর্গ-ইঞ্চি জায়গার উপর বায়ুর চাপ প্রায় ৭$\frac{১}{২}$ সের।

বায়ুর সর্বদিকে চাপ—বায়ু ঊর্ধ্বদিকে, নিম্নদিকে এবং পার্শ্বে অর্থাৎ **সকল দিকেই চাপ দেয়**। কিন্তু সব দিকে এই চাপ সমান বলিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ বাহিরে প্রকাশ পায় না। হাতের পাতা বিস্তৃত করিলে উহার উপর বায়ু প্রায় দুই মণ ওজনের নিম্নচাপ প্রয়োগ করে; আবার ঐ বায়ুই হাতের তলায় ঠিক সমান ওজনের ঊর্ধ্বচাপ দেয়। এই দুই চাপ পরস্পর সমান ও বিপরীত বলিয়া হাতে কোন চাপ অনুভূত হয় না। যে-কোন পাত্র বা প্রকোষ্ঠের বায়ুর সহিত বাহিরের মুক্ত বায়ুর সংযোগ থাকিলেই উহাদের চাপ সমান হইবে। আবার বায়ু-মণ্ডলের নির্দিষ্ট চাপে কোন পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু থাকিতে পারে বা আবদ্ধ করা যায়। কোন প্রকারে পাত্রস্থ বায়ুর এই পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো গেলে, উহার চাপ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় কম বা বেশী হইবে। একটি খোলা ছোট বোতলের মধ্যে খুবই অল্প বায়ু থাকে, কিন্তু বাহিরের বায়ু যেমন সব দিক হইতে বোতলের গায়ে চাপ দেয়, ভিতরের অল্প বায়ুও সমান মাত্রায় সব দিক দিয়া বোতলের ভিতরকার দেওয়ালে চাপ প্রয়োগ করে। বোতলটি ছিপিবদ্ধ করিলে তখনও ভিতরকার বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান থাকিয়া যায়। কাজেই বাহিরের বায়ুর চাপে বোতল ভাঙ্গিয়া যায় না। এইরূপ সর্বত্র

বিপরীতমুখী সমান চাপ আমাদের অথবা অন্যান্য জিনিসের উপর পড়ে বলিয়া, বায়ুমণ্ডলের চাপ অনুভব করা যায় না; কোন জিনিসের উপর ঐ চাপের প্রভাবও দেখা যায় না।

বায়ুর চাপের পরীক্ষা—দুই-মুখ-খোলা একটি কাচপাত্র বাতপাম্পের প্লেটের উপর স্থাপন কর। প্লেট ও পাত্রের সন্ধিস্থলে ফাঁক থাকিলে, ভেসিলিন দ্বারা বন্ধ কর। এখন পাত্রের উপরের খোলা মুখ পাতলা রবার দিয়া এমনভাবে মুড়িয়া ফেল যেন উহা বেশ সমতল থাকে। তারপর পাম্প চালাইয়া ভিতরকার বায়ু যেমনি বাহির করিতে থাকিবে, অমনি দেখিতে পাইবে রবার নীচের দিকে নামিতে নামিতে শেষে সশব্দে



বায়ুর নিম্নচাপে রবার ফাটিয়া গেল

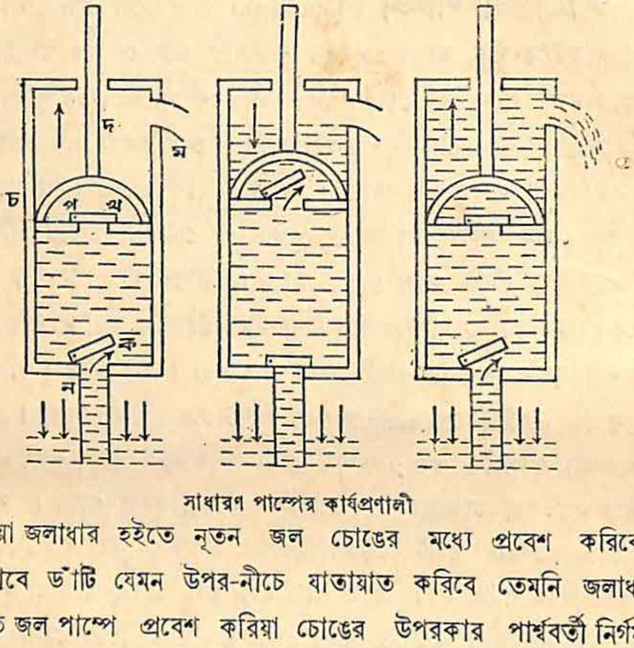
ফাটিয়া যাইবে। কেন এরূপ হয়? পাম্প চালাইবার পূর্বে রবারের উপরে ও নীচে বায়ুর নিম্ন ও ঊর্ধ্বচাপ সমান ছিল বলিয়া রবারের উপরিভাগ সমতল ছিল। কিন্তু কাচপাত্রটি বায়ুশূন্য করার সঙ্গে সঙ্গে, ভিতরকার বায়ুর ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ ক্রমে কমিতে থাকে। কিন্তু বাহিরের বায়ুর **প্রবল নিম্নচাপ সমান মাত্রাতেই** বরাবর রবারের উপর প্রযুক্ত হয়। এই নিম্নচাপে রবারটি ক্রমে নামিয়া আসে এবং শেষে প্রসারণের টান সামলাইতে না পারিয়া ফাটিয়া যায়।

সাধারণ পাম্প, পিচকারি প্রেষক পাম্প প্রভৃতি সম্পর্কে বায়ুর চাপ

সাধারণ পাম্প (Common Suction Pump)—নীচু জায়গা হইতে উঁচু জায়গাতে জল তুলিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় উহার নাম পাম্প বা শোষক যন্ত্র। সাধারণ পাম্পে (১৪ পৃষ্ঠার চিত্র) বড় চোঙের (barrel) মত একটি অংশ (চ) একটি সরু পাইপ বা নলের (ন) সহিত যুক্ত আছে। নলের নীচেকার খোলা মুখ থাকে কূপ বা অন্য কোন জলাধারের মধ্যে ডুবানো। চোঙের ভিতরে পিস্টন বা ডাঁটি নামে একটি অংশ (প) আছে। উহার সহিত সংযুক্ত একটি দণ্ডের (দ) সাহায্যে পিস্টনটিকে উপর-নীচে উঠানামা করানো যায়। চোঙ ও পাইপের সংযোগমুখে একটি ঢাকন বা ভাল্‌ভ (ক) আছে। পিস্টনের মাঝখানে একটি ছিদ্রপথের উপর আর একটি ঢাকন (খ) আছে। ঢাকন অনেকটা কপাটের মত ; কপাট যেমন একদিকে খোলে এবং বিপরীত দিকে বন্ধ হয়, ঢাকনের কার্যপ্রণালীও সেইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণ পাম্পের ঢাকন দুইটি কেবল উপরের দিকে খুলিয়া যাইতে পারে, নীচের দিকে পারে না। ফলে এই হয়, জল ঢাকন ঠেলিয়া সহজেই ছিদ্রপথ দিয়া উপরে যাইতে পারে। কিন্তু নীচের দিকে ঠেলা পাইলে ঢাকন ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেয়, জল নীচে আর যাইতে পারে না। চোঙের উপরিভাগে এক পার্শ্বে জল নির্গমনের একটি পথ (ম) আছে।

কার্যপ্রণালী—পিস্টন বা ডাঁটি উপর দিকে টানিলে (upward stroke) পিস্টনসংলগ্ন ঢাকন (খ) উপরের বায়ুর চাপে বন্ধ থাকে এবং বাহিরের বায়ুর চাপে নীচেকার ঢাকন (ক) ঠেলিয়া জল চোঙে প্রবেশ করে। ডাঁটি নীচের দিকে ঠেলিলে আবদ্ধ জলের ঊর্ধ্বচাপে উপরকার ঢাকন (খ) খুলিয়া যাইবে এবং জল পিষ্টনের ছিদ্রপথ দিয়া পিস্টনের উপরে চলিয়া আসিবে ; এই সময় জলের নিম্নচাপে নীচেকার

ঢাকন (ক) বন্ধ থাকিবে। ডাঁটি আবার উপর দিকে টানিলে পিস্টনের উপরকার সঞ্চিত জল চোঙের পার্শ্ববর্তী নির্গমন পথ দিয়া বাহির হইবে। এই সময় উপরের ঢাকন (খ) বন্ধ থাকিবে এবং নীচের ঢাকন (ক)



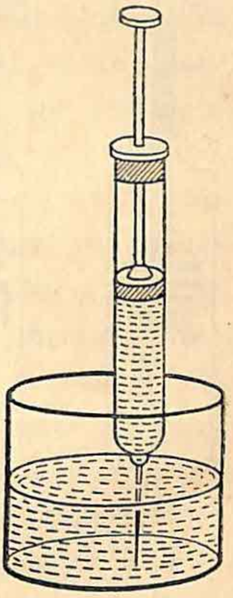
সাধারণ পাম্পের কার্যপ্রণালী

ঠেলিয়া জলাধার হইতে নূতন জল চোঙের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইভাবে ডাঁটি যেমন উপর-নীচে যাতায়াত করিবে তেমনি জলাধার হইতে জল পাম্পে প্রবেশ করিয়া চোঙের উপরকার পার্শ্ববর্তী নির্গমন পথ দিয়া থামিয়া থামিয়া বাহির হইতে থাকিবে। ডাঁটি উপর দিকে টানিবার সময়ই পাম্প হইতে জল পাওয়া যাইবে ; কিন্তু নীচের দিকে ঠেলিবার সময় কোন জল বাহির হইবে না।

সাধারণ পাম্পের দুইটি ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ এই পাম্প চালানোর সময় জল থামিয়া থামিয়া বাহির হয়, অনবরত হয় না। বায়ুর চাপে একটি বায়ুশূন্য নলে ৩০ ইঞ্চি উচ্চতায় পারদস্তম্ভ, আর ৩০ ফুট উচ্চতায় জলস্তম্ভ উঠিতে পারে। সাধারণ পাম্প বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে, কাজেই ইহার সাহায্যে ৩০।৩২ ফুটের অধিক উঁচুতে জল তোলা যায়

না। যাহাতে অনবরত এবং অনেক উঁচুতে জল পাওয়া যায় তাহার জন্য আরও উন্নত ধরণের পাম্প নির্মিত হইয়াছে।

পিচকারি (Syringe)—নিম্নতল হইতে উচ্চতলে জল তুলিবার জন্য সর্বাপেক্ষা সহজ ধরনের যে পাম্প ব্যবহৃত হয় তাহা হইল পিচকারি। কাচ বা ধাতু-নির্মিত একটি চোঙের ভিতর জল-রোধী একটি ঠেলক বা পিস্টন একটি হাতলযুক্ত লম্বা দণ্ডের সহিত আটকান থাকে। ঐ পিস্টনটি চোঙের ভিতরে দণ্ডের সাহায্যে ইচ্ছামত উঠানো-নামানো যাইতে পারে। চোঙের একটি প্রান্ত একটি সরু নলের সহিত সংলগ্ন থাকে উহাকে স্থচীমুখ (nozzle) বলে।

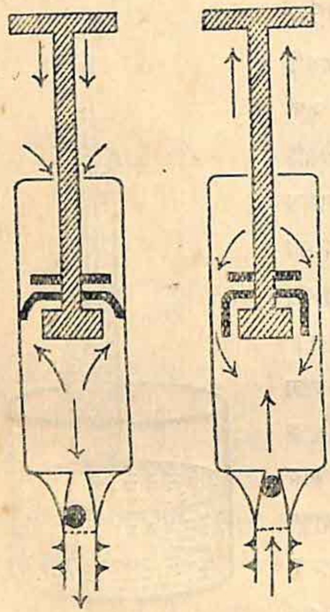


পিচকারির কার্যপ্রণালী

কার্যপ্রণালী—স্থচীমুখকে জলে ডুবাইয়া পিস্টনকে উপরের দিকে টানিলে পিস্টনের নিম্নে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, ফলে চোঙের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম হয়; সুতরাং ভিতরের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য জল চোঙের ভিতর প্রবেশ করে। পুনরায় পিস্টনকে স্থচীমুখের দিকে ঠেলিলে চোঙের অভ্যন্তরস্থ চাপ বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে ফলে স্থচীমুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

প্রেষক পাম্প (Inflator)—এই পাম্পদ্বারা কোন আবদ্ধ স্থানের ভিতর বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। আবদ্ধ স্থানকে গ্রাহক বলা হয়। গাড়ির চাকার টিউব, ফুটবলের ব্লাডার, ইহারা

গ্রাহকের দৃষ্টান্ত। পিচকারির মত ইহাও একটি ধাতুনির্মিত চোঙ এবং ইহার একপ্রান্তে একটি সূচীমুখ আছে। চোঙের ভিতর একটি পিস্টন আছে, পিস্টনের সহিত একটি বাটির আকৃতি চর্মনির্মিত ভাল্‌ভ বা ঢাকনা সংযুক্ত থাকে, উহার ইংরাজী নাম ওআশার (washer)।



প্রেষক পাম্পের কার্যপ্রণালী

ওআশারের পরিধি চোঙের আভ্যন্তরীণ পরিধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় থাকে। সূচীমুখের ভিতর একটি ছোট হালকা বল থাকে উহা ভাল্‌ভের কাজ করে। বলটির পরিধি সূচীমুখের ছিদ্রের পরিধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হাওয়ায় ছিদ্র দিয়া বলটি বাহির হইয়া আসিতে পারে না। সূচীমুখের ভিতর আড়াআড়ি ভাবে লাগানো একটি সচ্ছিদ্র পর্দা থাকে, উহার উপর বলটি রক্ষিত হয়। পর্দা সচ্ছিদ্র হওয়ার ফলে গ্রাহকের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিবার পথে বল কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

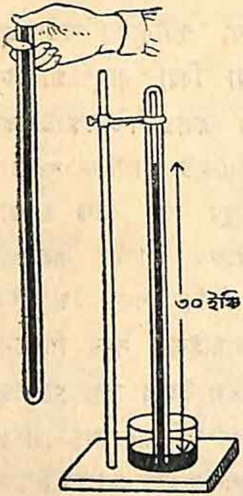
কার্যপ্রণালী—পাম্পের সূচীমুখ কোন গ্রাহকের (যেমন কোন ফুট বলের ব্লাডারের) সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং পিস্টনটিকে টানিয়া উপরে উঠাইয়া রাখা হইল। এক্ষণে পিস্টনকে গ্রাহকের দিকে চাপ দিলে চোঙের অভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রেষিত হয় এবং বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওআশারটির নীচে চাপ পড়ে। ঐ চাপের ফলে ওআশারটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইয়া পিস্টনের দেওয়ালের সহিত ঠিকমত আটকাইয়া যায় এবং চোঙের

অভ্যন্তরস্থ বায়ু আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পিস্টনকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকিলে এই চোঙমধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ুর চাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গ্রাহকের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক বেশী হয় এবং সূচীমুখের অভ্যন্তরস্থ বলকে বায়ু-নির্গমনের ছিদ্রপথ হইতে সরাইয়া দিয়া বায়ু গ্রাহকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (১৬ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ)। এবার পিস্টনকে উপরের দিকে টানিলে সূচীমুখ ও পিস্টনের মধ্যে একটি আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি করে, ফলে গ্রাহকের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ বেশী হওয়ায় উহা বলটিকে ঠেলিয়া সূচীমুখের চোঙের দিকের প্রান্তের ছিদ্রপথটি বন্ধ করিয়া দেয় এবং গ্রাহক হইতে বায়ুর নির্গমন পথও বন্ধ হইয়া যায়। পিস্টনকে ঠেলিয়া নীচের দিকে নামাইবার সময় পিস্টনের উপরিভাগে যে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হইতেছিল উহার চাপ বাহিরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা যথেষ্ট কম ছিল একারণ বাহিরের বায়ু চোঙের উপরিভাগস্থিত পিস্টন দণ্ডের যাতায়াতের ছিদ্রপথ অথবা চোঙের উপরি-ভাগে নির্মিত ছিদ্রপথ দিয়া চোঙের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। এবার পিস্টনকে উপরের দিকে টানিতে থাকিলে পিস্টনের উপর অংশে চোঙের ভিতর যে বায়ু ছিল তাহা প্রেষিত হইয়া নির্গমনের পথ অন্বেষণ করে এবং ওআশারের পার্শ্ব দিয়া পিস্টনের নিম্নস্থিত আংশিক শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে, ফলে চোঙটি আবার বায়ুপূর্ণ হয়। পুনরায় পিস্টনকে নীচের দিকে ঠেলিলে পূর্ববর্ণিত প্রথামত গ্রাহকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে।

ব্যারমিটার বা চাপমান যন্ত্র (Barometer)—বায়ুমণ্ডলের চাপ নিরূপণ করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহার নাম ব্যারমিটার বা চাপমান যন্ত্র।

সরল চাপমান যন্ত্র (Simple Barometer)—এক-মুখ-বন্ধ একটি লম্বা কাচনল (৩ ফুট দীর্ঘ) পারদে পরিপূর্ণ কর। পারদ ভরতি করার সময় যেন একটুও বায়ু ভিতরে থাকিয়া না যায়। এখন

পারদপূর্ণ নলের খোলা মুখটি ডানহাতের কোন অঙ্গুলি দিয়া বেশ জোরে চাপিয়া ধর এবং নলটি উপুড় করিয়া উক্ত মুখটি পারদপূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া ডানহাত সরাইয়া লও। তারপর নলটি ঐ পাত্রের পারদের উপর লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া কাঠের ক্ল্যাম্প দিয়া আটকাইয়া দাও। দেখ, খানিকট পারদ নল হইতে নামিয়া অসিল এবং নলের মধ্যেও অনেক উঁচু অবধি একটি পারদস্তম্ভ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছে। স্কেল দিয়া মাপিলে দেখিবে, উপরিকথিত পাত্রের পারদের উপরিভাগ হইতে পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৩০ ইঞ্চি; অতএব জানা গেল **বায়ুমণ্ডলের চাপে প্রায় ৩০ ইঞ্চি উঁচু একটি পারদস্তম্ভ কোন বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে** অর্থাৎ বায়ু-মণ্ডলের চাপ আর এই পারদস্তম্ভের ওজন সমান। কাচনলটির মুখের ক্ষেত্রফল যাহাই হউক না কেন, বায়ুর চাপে উহার মধ্যে প্রায় ৩০ ইঞ্চি পারদস্তম্ভ দাঁড়াইবেই। বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়িলে ঐ পাত্রের খানিকটা পারদ কাচনলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দেয়। আবার চাপ কমিলে কাচনলের ভিতরকার খানিকটা পারদ ঐ পাত্রে নামিয়া আসিয়া ঐ পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য কমাইয়া দেয়। কাজেই পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য দ্বারাই আমরা বায়ুমণ্ডলের চাপ সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকি। উপরে এই যে পারদপূর্ণ কাচনলটির কথা বলা হইল, ইহা **চাপমান যন্ত্র** নামে পরিচিত। কাচনলের উপরিভাগে যে ফাঁকা জায়গা দেখা যায় উহাতে একটুও বায়ু নাই। **ঐ শূন্য স্থানটিকে 'টরিসেলীয় ভ্যাকুআম'**



সরল চাপমান যন্ত্র

(Torricellian Vacuum) বলা হয়। কোন প্রকারে ঐ ফাঁকে বায়ু ঢুকিয়া গেলে যন্ত্রটি অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। তখন সাবধানে ঝাঁকানি দিয়া ঐ বায়ু বাহির করিয়া দিলে, যন্ত্রটি আবার দোষমুক্ত হয়।

ফর্টিনের চাপমান যন্ত্র (Fortin's Barometer)—সাধারণ ব্যারমিটারে একটি বিশেষ ত্রুটি হইতেছে যে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইলে আধারস্থিত পারদ নলের মধ্যে প্রবেশ করে আবার চাপের হ্রাস হইলে নল হইতে পারদ নামিয়া আসিয়া আধারে প্রবেশ করে, ফলে আধারস্থ পারদের উপর-তল চাপের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে অবিরত পরিবর্তিত হয়। এই জন্য এইরূপ যন্ত্রে পারদের উপর-তল এবং উচ্চতা মাপিবার স্কেলের শূন্যবিন্দুকে নিয়মিত সমসূত্রে রাখা যায় না। ফর্টিন তাঁহার উদ্ভাবিত চাপমান যন্ত্রে এই ত্রুটি দূর করিয়াছেন—এই যন্ত্রের নামই ফর্টিনের ব্যারমিটার।

এই ব্যারমিটারে পারদাধারটি নমনীয় (flexible) চর্মদ্বারা নির্মিত। আধারের নীচে একটি স্ক্রু থাকে, উহাকে ঘুরাইয়া পারদাধারটিকে ইচ্ছামত উঠান বা নামান যাইতে পারে। আধারস্থিত পারদপৃষ্ঠের উপরে একটি হস্তিদন্তনির্মিত সূচক আটকানো থাকে, ঐ সূচকটি স্কেলের শূন্য চিহ্নের সহিত সমসূত্রে থাকে। চাপের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে আধারস্থ পারদের উপর-তলের পরিবর্তন হইলে নীচেকার স্ক্রু ঘুরাইয়া পারদপৃষ্ঠকে ঠিক আবার সূচকের সহিত সমসূত্রে আনা হয়, অর্থাৎ স্কেলের শূন্য বিন্দুর সহিত সমসূত্রে আনা হয়।



ফর্টিনের চাপমান যন্ত্র

বায়ুর চাপ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে আধারের নীচেকার স্ক্রু ঘুরাইয়া পারদপৃষ্ঠ সূচক তথা স্কেলের শূন্য বিন্দুর সহিত সমসূত্রে আনা হয়, পরে পারদ-নলের সহিত সংলগ্ন স্কেলের সাহায্যে আধারস্থিত পারদের উপর-তল হইতে নল মধ্যস্থ পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য মাপিয়া লওয়া হয়। এই পারদ-স্তম্ভের চাপই সেই সময়কার বায়ুর চাপের পরিমাণ, অর্থাৎ পারদস্তম্ভের এই দৈর্ঘ্যই সেই সময়কার বায়ুর চাপ নির্দেশ করে। এই দৈর্ঘ্য যদি ৭৬০ মিলিমিটার বা ৩০ ইঞ্চি হয় তবে সেই সময়কার বায়ুর চাপ বলিতে আমরা ৭৬০ মি. মি. বা ৩০ ইঞ্চি বুঝিব। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুর চাপ জানিবার জন্য চাপমান যন্ত্র-সংলগ্ন একটি তাপমান যন্ত্র থাকে।

পারদস্তম্ভের উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যারমিটার-সংলগ্ন স্কেল ছাড়াও সঠিক ভাবে উচ্চতা মাপিবার জন্য আর একটি সহকারী স্কেল থাকে উহার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। সাধারণ স্কেলের পঠনের সহিত ভার্নিয়ার স্কেলের পঠন যোগ করিয়া লইলেই সঠিক উচ্চতা পাওয়া যাইবে।

আবহাওয়া সম্পর্কে বায়ুর চাপ—বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ৭৬০ মি. মি. বা ৩০ ইঞ্চি, অর্থাৎ ৭৬০ মি. মি. বা ৩০ ইঞ্চি উচ্চ পারদ-স্তম্ভের সমান। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কমি-বেশির জন্য এই উচ্চতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডলে বায়ুর অন্যান্য উপাদানের সহিত অল্পাধিক মাত্রায় জলীয় বাষ্প সর্বদা মিশিয়া থাকে। জলীয় বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা। কাজেই বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত বাড়ে, বায়ুর চাপও তত কমিয়া যায়। চাপ কমিবার ফলে চাপমান যন্ত্রে পারদ নামিয়া আসে এবং পারদস্তম্ভের উচ্চতা কম হয়। পক্ষান্তরে, গরম বায়ুতে খুব বেশী পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে এবং ঐ বায়ুর সহসা তাপবৈষম্য ঘটিলে, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দেখা দেয়। কাজেই চাপমান যন্ত্রে পারদস্তম্ভ দ্রুত নামিয়া আসিলে

ঝড়-বৃষ্টি যে আসন্ন এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্বেই করা সম্ভব। বায়ুর চাপের ক্রমবৃদ্ধি ভাল আবহাওয়ার সূচনা করে।

শ্বাসক্রিয়া, দহন ও উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্তীকরণ-জনিত বায়ুর গঠনের পরিবর্তন (অক্সিজেন ও কার্বনের বিবর্তন চক্র)—মানুষ ও যাবতীয় জীবজন্তর শ্বাসক্রিয়ায় দুটি কাজ আছে, শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ। শ্বাসগ্রহণের সময় বায়ুর অক্সিজেনকে দেহের ভিতরে নেওয়া হয়, আবার শ্বাসত্যাগের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কাঠ, কয়লা ও অন্যান্য দাহ্য বস্তুর দহনের সময়ও বায়ুর অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এইভাবে চলিলে বায়ুর অক্সিজেন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যাইত এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বায়ুর উপাদানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইত। ফলে জীবজন্ত অক্সিজেন অভাবে মরিয়া যাইত, এবং কাঠ প্রভৃতি জ্বালাইয়া আগুনের সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু বায়ুর গঠনের সমতা রক্ষিত হয়, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ফলে :—

উদ্ভিদ-জগতে গাছপালাদের প্রধানতঃ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপর নির্ভর করিতে হয়। জীবজন্তর মত গাছপালাও অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসক্রিয়ার জন্য। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যেই তাহারা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। কিভাবে ইহা সম্পন্ন হয় দেখা যাক্। গাছের পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশের ভিতর অসংখ্য সবুজ কণা থাকে, ইহাদের নাম ক্লোরোফিল। অঙ্গার জীবজন্ত ও উদ্ভিদ অর্থাৎ সমগ্র জীবের দেহ গঠনের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ সবুজ কণা অর্থাৎ ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ভাঙ্গিয়া উহা হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে বায়ুর অক্সিজেন অংশ কমিয়া যায়; এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু

উপরোক্তভাবে উদ্ভিদের অঙ্গার গ্রহণের ফলে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার নাম উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্তীকরণ।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের যে প্রায় নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে উহার কখন বিশেষ তারতম্য ঘটিতে পারে না।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি—

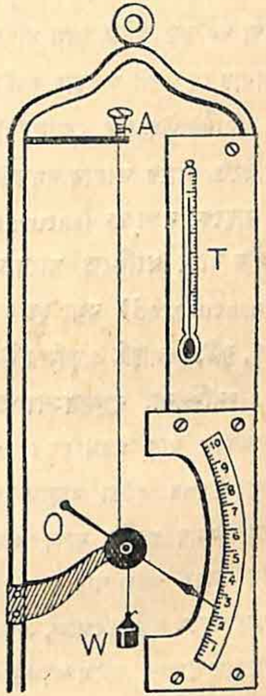
বায়ুতে কিছু **জলীয় বাষ্পও** আছে। দিবারাত্র নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে। একটি গ্লাসে খানিকটা জল লইয়া গ্লাসের বাহির দিকটা শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া লও; এখন জলের মধ্যে কয়েক টুকরা বরফ ফেলিয়া দাও। দেখিবে, গ্লাসের বাহিরে শিশিরবিন্দুর মত জল জমিয়া গিয়াছে। জল নিশ্চয়ই গ্লাসের মধ্য হইতে আসে নাই; বায়ু হইতে আসিয়াছে। এইভাবে সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পও কিছু পরিমাণে আছে।

এই জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির পরিমাপ করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহাকে **উন্দমান যন্ত্র** বা ইংরাজীতে **হাইগ্রোমিটার** (**Hygrometer**) বলে। এখানে আমরা এইরূপ একটি হাইগ্রোমিটার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হেয়ার (hair) হাইগ্রোমিটার বা চুলদ্বারা নির্মিত উন্দমান যন্ত্র—

চুলের একটি ধর্ম হইতেছে এই যে, বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উহা অপেক্ষাকৃত লম্বা হয় এবং জলীয় বাষ্পের মাত্রা কম হইলে সঙ্কুচিত হয়। চুলের এই প্রকার বিশেষ ধর্ম থাকায় উন্দমান যন্ত্র প্রস্তুতের কাজে ইহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাকেই চুলদ্বারা নির্মিত উন্দমান যন্ত্র বা ইংরাজীতে হেয়ার হাইগ্রোমিটার বলে।

চিত্রে নির্দেশিত যন্ত্রটির A বিন্দুতে কয়েক গাছা বেশ লম্বা চুল লইয়া উহার এক প্রান্তে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অপর প্রান্তটি O পুলির ভিতর দিয়া কয়েক পাক জড়াইয়া আনিয়া স্বল্প ওজন বিশিষ্ট বস্তুর (W) সহিত বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। এস্থলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ওজনটি এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যে উহার ভারে চুল ছিঁড়িয়া না যায়। O পুলির সহিত P একটি নির্দেশক সংলগ্ন আছে। নির্দেশকটি আবার ডায়ালের (dial) উপরিস্থিত স্কেলের উপর দিয়া যাতায়াত করে।



হেয়ার হাইগ্রোমিটার

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে চুল বর্ধিত হয় এবং ওজনের ভারে পুলিও নীচের দিকে ঘুরিয়া যায় ফলে নির্দেশকটিও নীচের দিকে নামিয়া যায়। আবার বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া গেলে চুলও সঙ্কুচিত হয় ফলে পুলি উপরের দিকে ঘুরিয়া যায় এবং নির্দেশকটিও উপরের দিকে উঠিয়া যায়।

ডায়ালস্থিত স্কেলের উপর নির্দেশকের অবস্থান দেখিয়া বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তাহার পরিমাণ করা হয়।

ঘনীভবন (condensation)—বায়ুতে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশিয়া থাকিতে পারে। বায়ু যত বেশী উষ্ণ হইবে উহা তত অধিক বাষ্প ধারণ করিতে পারিবে। বায়ু যত ঠাণ্ডা হইবে

উহাতে তত কম জলীয় বাষ্প থাকিতে পারিবে। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যতখানি বাষ্প ধারণ করিতে পারে, তাহার বেশী বাষ্প বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ বায়ুর সম্পৃক্ততার মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে ঐ অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইবে। এইরূপ কোন বাষ্প ঠাণ্ডা পাইয়া আবার যে তরল অবস্থায় আইসে তাহাকে **ঘনীভবন** বলা হয়।

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে তাহার সমস্তটাই যদি সেই বায়ুতে বর্তমান থাকে, তখন ঐ বায়ুকে সম্পৃক্ত (saturated) বলা হয়। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে তার কম থাকিলে ঐ বায়ুকে অসম্পৃক্ত (unsaturated) বলা হয়। ঘনীভবনের ফলে শিশির, কুয়াসা, তুষার, মেঘ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

শিশির, কুয়াসা ও তুষার—দিনের বেলায় ভূপৃষ্ঠ ও উহার উপরকার বায়ু গরম হয়। পুকুর, নদনদী প্রভৃতি হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিয়া থাকে। কিন্তু তাপ বেশী বলিয়া অনেক সময় জলীয় বাষ্প দ্বারা বায়ু সম্পৃক্ত হয় না, কাজেই ঘনীভূত হইয়া উহার জলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। রাত্রিকালে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমে কমিয়া গেলে, ঐ বায়ু জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে। তারপরে উষ্ণতা ক্রমে আরও কমিয়া গেলে, বায়ু আর সমস্তটা বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। অনেকটা ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং উহা আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় যুক্ত হইয়া বায়ুতে ভাসিয়া থাকে ও ঘাস, লতাপাতা, ঘরের চালের টিন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জিনিসের উপর সঞ্চিত হয়। ঘাস, দূর্বা, লতাপাতায় এই যে জলকণা জমে, উহার নাম **শিশির**; আর বায়ুতে বিদ্যমান ধূলিকণা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যে জলকণা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় উহাকে **কুয়াসা** বলা হয়। মাটির ঠিক উপরকার বায়ু যখন আরও উপরের বায়ুর চেয়ে ঠাণ্ডা হয়,

সাধারণতঃ তখন কুয়াসা জন্মে। শীতপ্রধান দেশের বায়ুর তাপ মধ্যে মধ্যে এত নামিয়া যায় যে, বায়ুর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পেঁজা তুলার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে পড়ে। ইহাকে তখন **তুষার** বলে। ভারতবর্ষের সিমলা, দার্জিলিং, নাইনিতাল প্রভৃতি হিমালয় অঞ্চলে এইরূপ তুষারপাত হইয়া থাকে।

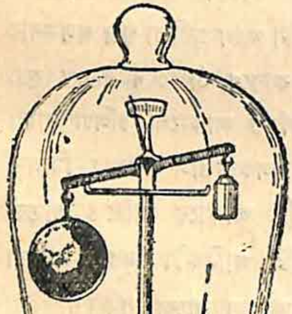
মেঘ ও বৃষ্টি—বায়ু গরম হইলে আয়তনে বাড়ে ও হালকা হয়। মাটির ঠিক উপরের বায়ু খুব উঁচু স্তরের বায়ুর তুলনায় সাধারণতঃ বেশী গরম থাকে। এইজন্য নীচেকার হালকা বায়ু ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে এবং উহার সহিত জলীয় বাষ্পও চলিয়া যায়। বাষ্পমিশ্রিত এই বায়ু আকাশের উঁচু স্তরে গিয়া ঠাণ্ডা হয়; এ ছাড়া উঁচু স্তরের বায়ুর উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। কাজেই এই দুই কারণে অধিক জলীয় বাষ্প উপরকার বায়ুতে থাকিতে পারে না; অনেকটা অংশ জুড়িয়া ক্ষুদ্র জলকণার আকারে **মেঘের** সৃষ্টি করে। যদি কোনও কারণে ঐ মেঘ উত্তপ্ত হয়, তবে উহা আবার বাষ্পে রূপান্তরিত হইয়া ঊর্ধ্বতর আকাশে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি উহা ক্রমে ঠাণ্ডা হইতে থাকে, তবে জলকণাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহৎ জলকণায় পরিণত হয় ও **বৃষ্টি** আকারে মাটিতে পতিত হয়। অনেক সময় এরূপও হয় যে, বৃষ্টি খানিকটা দূর নামিয়া নীচেকার গরম বায়ুর প্রভাবে পড়িয়া আবার বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। উহারা মাটি পর্যন্ত আর পৌছায়ই না। মরুভূমিতে এই কারণে বৃষ্টি খুব বিরল। কেননা মরুভূমির উপরের বাতাস খুব গরম থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিলে মেঘ ও কুয়াসা একই জাতীয় বস্তু। একই জলকণাসমষ্টি মটির ঠিক উপরিভাগে কুয়াসা এবং আকাশের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে মেঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যদি বৃষ্টি খুব ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়া পড়ে তবে খুব শৈত্যের ফলে উহার কিয়দংশ জমাট বাঁধিয়া **শিলাবৃষ্টির** সৃষ্টি করিয়া থাকে।

বায়ুর প্লবতা

যাবতীয় তরল পদার্থের ন্যায় বায়ু এবং অন্যান্য গ্যাসের প্লবতা আছে। আর্কিমেডিসের সূত্র অনুসারে **কোন** কঠিন বস্তু বায়ুতে নিমজ্জিত হইলে তৎকর্তৃক অপসারিত বায়ু বস্তুটির উপর একটা ঊর্ধ্বচাপ দেয়। অপসারিত বায়ুর ভরের সমতুল্য ভার বস্তুটির কমিয়া যায়। ফলে বস্তুটি উপরের দিকে ভাসিয়া উঠিতে চায়। **ঊর্ধ্বচাপের জন্য বস্তুর এই ভাসিয়া উঠার ধর্মকে বলা হয় প্লবতা।**

প্লবতার পরীক্ষা—একটি বায়ুপূর্ণ কাচ-গোলক তুলাযন্ত্রের বাম বাহু হইতে ঝুলাইয়া তুলাযন্ত্রের অন্য বাহুতে ধাতুর ওজন চাপাইয়া ভারসাম্য আনয়ন করা হইয়াছে। এখন সমগ্র বস্তুটি বায়ু-পাম্পের গ্রাহকযন্ত্রের প্লেটের উপর সংস্থাপিত করিয়া কাচের বেলজার দ্বারা এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হইল যাহাতে বায়ুর চলাচলের কোন পথ না থাকে। পাত্রমধ্যস্থ বায়ু, পাম্পের সাহায্যে নিষ্কাশিত করিয়া লইলে দেখা যাইবে গোলক সহ বাম বাহুটি নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ গোলকের ভার ডান বাহু হইতে ঝুলানো ওজনের চেয়ে বেশী হইয়াছে।



প্লবতার পরীক্ষা

কাচ-গোলকের আয়তন, ঝুলানো ওজনের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়। গোড়ায় গোলকের আপাত ওজন, ঝুলানো ওজনের আপাত ওজনের সমান করা হইয়াছে। প্লবতার জন্য গোলকের ওজন বেশী কমিয়া

গিয়াছে। কাজেই বায়ু নিষ্কাশনের ফলে প্লবতার ক্রিয়া আর না থাকায় গোলকের আসল ওজন ধাতুর ওজনের চেয়ে বেশী হইয়া পড়িল।

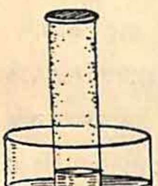
বেলুন—বায়ুর প্লবতার জন্য হাইড্রোজেন প্রভৃতি বায়ু অপেক্ষা লঘুতর গ্যাসপূর্ণ বেলুন, বায়ুর মধ্য দিয়া উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। উচ্চস্তরে বায়ুর ঘনত্ব যত কমিতে থাকে, উহার প্লবতাও ক্রমশঃ সেই পরিমাণে কমিতে থাকে এবং ঐ কারণে বেলুনটির আয়তনও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পরিশেষে যে উচ্চতায় বায়ুর প্লবতার পরিমাণ বেলুনের ভরের সমান সেখানে বেলুনটি স্থির হইয়া থাকে। বেলুনের উত্তোলন ক্ষমতা বেলুনের সমগ্র ভর এবং উহা দ্বারা অপসৃত বায়ুর ভরের পার্থক্যের সমান। হিলিয়াম গ্যাস খুব লঘু কিন্তু হাইড্রোজেনের চেয়ে কিছু ভারী। অনুরূপ অবস্থায় হিলিয়াম গ্যাস-পূর্ণ বেলুন হাইড্রোজেন-পূর্ণ বেলুন অপেক্ষা লঘুতর ভার উত্তোলন করিতে পারে। সুতরাং বেলুন পূর্ণ করিতে হিলিয়ামের পরিবর্তে হাইড্রোজেনই প্রশস্ত। খুব উঁচুতে উঠিলে বেলুনের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা বিদীর্ণ না হইতে পারে এজন্য ভূপৃষ্ঠে বেলুনকে উহার গরিষ্ঠতম আয়তনের চতুর্থাংশ মাত্র হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করা হয়। উঁচুতে উঠিবার সময় বেলুন-সংলগ্ন নৌকায় রক্ষিত বালুকার কিছুটা ফেলিয়া বেলুনকে হালকা করা হয়। নীচে নামার সময় একটি ভাল্‌ভের মুখ সাময়িক ভাবে খুলিয়া গ্যাস ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

দহন, শ্বাসকার্য ও মরিচা পড়া

দহন ও দাহ্য পদার্থ (Combustion and Combustible substance)—তোমরা সকলেই জান, কাঠ ও কয়লা জলে এবং জ্বলিবার পর অবশিষ্ট থাকে সামান্য ভস্ম; তৈলও জলে কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কাঠ, কয়লা, তৈল এগুলি **দাহ্য** (combustible) পদার্থ। কিন্তু বায়ুর অভাব হইলে এইগুলির কিছুই জলে না। প্রজ্বলিত কাঠে মাটি

চাপা দিলে উহা নিভিয়া যায়। কোন বস্তু জলিবার বা পুড়িবার সময় বায়ুর সব অংশটুকু কার্যকরী হয় না—**উহার মধ্যস্থিত অক্সিজেন গ্যাসই প্রয়োজনে আসে**। জলিবার সময় দাহ্য পদার্থ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। এই রাসায়নিক মিলন ঘটার জন্যই তাপ (heat) ও আলোক (light) উদ্ভূত হয়। যে অংশ হইতে তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি তাহাকেই দীপশিখা (flame) বলে এবং কোন বস্তু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া যদি তাপ ও আলোক প্রদান করে তবে ঐ ক্রিয়াকে **দহন** (combustion) বলে।

লৌহে মরিচা ধরা—লৌহে মরিচা ধরাও এক প্রকারের দহন। একখণ্ড চকচকে লোহা কিছুদিন রৌদ্রে, জলে বা খোলা জায়গায় রাখিয়া দাও। কিছুদিন পরে দেখিবে, তাহার উপর লাল বর্ণের মরিচা ধরিয়াছে। মরিচা ধরার সময় বায়ুর অক্সিজেন গ্যাসই প্রধানতঃ লোহার সহিত মিলিত হয় এবং এই মিলনের ফলে লোহার ওজন বৃদ্ধি পায়।



লৌহে মরিচা ধরা

একটি গ্যাস-জার জলে ভিজাইয়া উহার মধ্যে কিছু চকচকে লোহারগুঁড়া রাখিয়া বেশ করিয়া নাড়; জলসিক্ত গুঁড়াগুলি জারের গায়ে লাগিয়া যাইবে। এখন একটি পাত্রে কিছু জল রাখিয়া জারটি ঐ পাত্রের উপর উপুড় করিয়া বসাও। দেখিবে, ঐ জারের মধ্যে অনেক-খানি বায়ু আবদ্ধ আছে। মোটামুটি কতখানি বায়ু আছে মাপিয়া লও এবং এইভাবে জারটি কয়েকদিন রাখিয়া দাও। প্রায় সপ্তাহ কাল পরে দেখা যাইবে লোহার গুঁড়াগুলি চকচকে নাই—তাহাতে মরিচা ধরিয়াছে; এবং জারটির প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ পর্যন্ত জল উঠিয়াছে, অর্থাৎ জারে আবদ্ধ বায়ুর পরিমাণ কম হইয়াছে।

পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, জারের মধ্যে যে আবদ্ধ গ্যাস আছে উহা

নাইট্রোজেন। বায়ুর অক্সিজেন ধীরে ধীরে লৌহের সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইড অব্ আয়রন নামে একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাকেই সাধারণতঃ লৌহে মরিচা ধরা বলে। এখানেও লৌহ অপেক্ষা মরিচা-ধরা লৌহের ওজন বেশী এবং বেশী ওজনটুকুই অক্সিজেনের ওজন। এই মরিচাও একপ্রকার অক্সাইড।

শুষ্ক বায়ুতে অর্থাৎ জলীয় বাষ্পহীন বায়ুতে লোহার উপর শীঘ্র মরিচা পড়ে না। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি—মরিচা ধরার একটি কারণ; বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকাও মরিচা ধরার দ্বিতীয় কারণ। মরিচা ধরিলে লৌহ শীঘ্র নষ্ট হয় বলিয়া লোহার কড়ি, গরাদে প্রভৃতির উপর রঙের আবরণ দিয়া রাখা হয়। ইহাতে শীঘ্র লৌহের উপর মরিচা ধরে না।

পূর্বের পরীক্ষায় আমরা দেখিয়াছি বাতি, গন্ধক কিংবা ম্যাগনেসিয়াম ধাতু জ্বলিবার সময় তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি কিন্তু লৌহ মরিচায় পরিণত হইবার সময় তাপ বা আলোক কিছুই পাই না। মরিচা-ধরা প্রক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে হয় বলিয়া যে তাপটুকু সৃষ্টি হয়, তাহা বাতাসেই চলিয়া যায়। সুতরাং মরিচা ধরাকে ঠিক দহন না বলিয়া **মৃদু দহন** (slow combustion) বলা যাইতে পারে।

দহন ও শ্বাসকার্য—আমরা শরীর রক্ষার জন্য যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি দেহের মধ্যে সেই সকল পদার্থের দহন চলিতেছে। খাদ্যদ্রব্য দহনের জন্য যে অক্সিজেন আবশ্যক হয় তাহা আমরা নিয়তই প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি। তবে এই দহন মোমবাতির দহনের মত তীব্র নহে—লৌহের মরিচা ধরার মত ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য দহনের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহাতেই দেহের তাপ রক্ষা হয়। চাল-ডাল উন্মুক্ত বায়ুতে দগ্ধ করিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়—আমাদের শরীরের মধ্যেও খাদ্য-দহনের ফলে

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হইতেছে। এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সহিত আমরা পরিত্যাগ করি।

পরিষ্কার চুনের জলে ফুৎকার দিলে উহা ঘোলা হইয়া যায়, ইহাতে নিঃশ্বাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

দহন ও শ্বাসকার্যের পার্থক্য—

(১) দহন তীব্রভাবে হয় ও ইহার ফলে আলোক ও তাপ পাইয়া থাকি।

শ্বাসকার্যে দহন ধীরে ধীরে হয়—আলোক ও তাপ পাই না—ধীরে ধীরে তাপ সৃষ্টি হইয়া শরীরের তাপ রক্ষা হয়।

(২) দহনের ফলে তৈল, ঘৃত বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

শ্বাসকার্যে ঐ সকল পদার্থ হইতে ঐ ঐ জাতীয় পদার্থই উৎপন্ন হয়।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই অক্সিজেন গ্যাস অবশ্যক হয়।

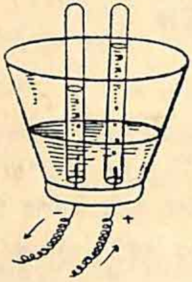
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জল

জলের গঠন—প্রাচীন কালে জলকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু পরে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশের পরীক্ষায় দেখা গেল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থের রাসায়নিক মিলনে জল গঠিত হইয়াছে। জল যৌগিক পদার্থ সুতরাং ইহার উপাদানগুলি এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। জলকে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উহা দুইটি গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে ; ঐ বিশ্লিষ্ট গ্যাস দুইটির মধ্যে একটির আয়তন অপরটির আয়তনের দ্বিগুণ। পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়, যে গ্যাসটির আয়তন বেশী উহা হাইড্রোজেন। **অতএব দেখা গেল জলের মূল উপাদান দুইটি গ্যাস, উহার একটি হাইড্রোজেন ও অপরটি অক্সিজেন।**

তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা জলের বিশ্লেষণ—একটি কাচের ফানেলের মুখটা কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ একটি পাত্র লও, এবং উহার সরু মুখটি কর্ক দিয়া ভালভাবে আটকাও এবং কর্কের মধ্যে দুইটি সরু ছিদ্র কর। তারপর, প্লাটিনামের পাতযুক্ত দুইটি তামার তার ঐ ছিদ্র দুইটির মধ্য দিয়া এমনভাবে প্রবেশ করাইয়া দাও যে প্লাটিনামের পাত দুইটি ফানেলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। তামার তার দুইটির অপর প্রান্ত তড়িৎ-কোষের দুইটি মেরুর সহিত সংযুক্ত করিয়া পাত্রটিতে জল ঢাল। জল তড়িৎ পরিবাহক নয় বলিয়া উহাতে অল্প পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাও, যাহাতে তড়িৎপ্রবাহ চলিতে পারে।

পরে দুইটি দাগ-কাটা পরীক্ষা-নল জলপূর্ণ করিয়া প্লাটিনাম পাত দুইটির উপর খাড়াভাবে উলটাইয়া রাখ। এই বার বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্ আকারে গ্যাস উঠিতেছে ও নলমধ্যস্থ জল নামিয়া যাইতেছে। কিছু সময় বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইবার পরে দেখা যাইবে, প্রত্যেক পরীক্ষা-নলে কিছু কিছু গ্যাস জল সরাইয়া জমিয়াছে। একটি নলে



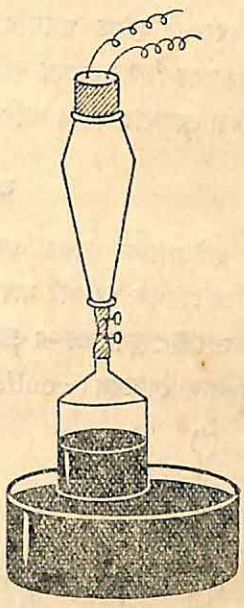
জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ

সংগৃহীত গ্যাসের আয়তন অপরটির দ্বিগুণ। নল দুইটির মুখ এক এক করিয়া বুড়া আঙ্গুল দ্বারা বন্ধ করিয়া জল হইতে তুলিয়া আন এবং কোন্‌টিতে কোন্ গ্যাস জমিয়াছে তাহা পরীক্ষা কর। যে নলটিতে বেশী গ্যাস আছে উহাতে অর্ধ-জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে যে কাঠি নিভিয়া গেল, কিন্তু গ্যাসটি নিজেই জ্বলিতে লাগিল ; ইহা হাইড্রোজেনেরই স্বাভাবিক ধর্ম, অতএব উহা হাইড্রোজেন গ্যাস। অপর নলটিতে অর্ধ-জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে দেখিবে উহা তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল, কাজেই উহা অক্সিজেন গ্যাস। কেননা অক্সিজেন কোন বস্তুকে জ্বলিতে সাহায্য করে। **এই পরীক্ষা হইতে জানা গেল যে, আয়তন হিসাবে জলের উপাদানে আছে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন।**

সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় জল প্রস্তুতকরণ—

ক্যাভেণ্ডিশের পরীক্ষা—দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনকে সংশ্লিষ্ট করিয়া জল প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে ক্যাভেণ্ডিশই বাহির করিয়াছিলেন। দুই মুখ খোলা, এক মুখ অপেক্ষাকৃত সরু এইরূপ লম্বা ধরণের একটি সুদৃঢ় কাচপাত্র লওয়া হইল। অপেক্ষাকৃত

চওড়া মুখের দিকের ছিদ্রপথ দিয়া দুইটি প্লাটিনামের তার প্রবেশ করাইয়া কাচ গলাইয়া মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সরু মুখটিতে একটি স্টপ-কক্ লাগাইয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে শোষক পাম্প দ্বারা কাচপাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইল এবং স্টপ-কক্ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এইবার কাচ-পাত্রটিকে একটি বেলজারের সহিত যোগ করিয়া বেলজারটিকে একটি পারদপূর্ণ আধারে রাখা হইল। বেলজারের ভিতর দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেন প্রবেশ করানো হইল। এক্ষণে উপরের কাচপাত্রের স্টপ-কক্ খুলিলে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য বেলজার হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে।



ক্যাভেণ্ডিশের পরীক্ষা

এক্ষণে স্টপ-কক্ বন্ধ করিয়া প্লাটিনাম তার দুইটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির দুইটি মেরুর (পজিটিভ ও নেগেটিভ) সহিত যোগ করিয়া দিলে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইবে যাহার ফলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুইটি সংশ্লিষ্ট হইয়া জলে পরিণত হইবে। ঐ জল, পাত্রের ভিতরের দিকের গায়ে বিন্দু বিন্দু জমিবে। কিন্তু ঐ জলের পরিমাণ এতই সামান্য যে, বস্তুতঃ উহা পাত্রের অভ্যন্তরস্থ কোন আয়তনকেই অধিকার করিয়া থাকে না এবং কাচপাত্রটি প্রায় পূর্বের ন্যায় শূন্যই থাকিয়া যায়। পুনরায় স্টপ-কক্ খুলিয়া উহার ভিতর গ্যাস প্রবেশ করানো হয় এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়া অনুরূপ ভাবে জল প্রস্তুত করা

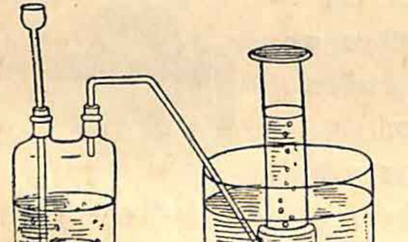
হয়। কয়েকবার এইরূপ করায় উপরের পাত্রে খানিকটা জল প্রস্তুত করা যায়।

বেলজার হইতে গ্যাস ব্যয়িত হইবার ফলে পারদাধার হইতে পারদ বেলজারের ভিতর প্রবেশ করিবে। বেলজারের ভিতর পারদপৃষ্ঠের উচ্চতা দেখিয়া বেলজার হইতে ব্যয়িত গ্যাসের পরিমাপ করা যায়।

হাইড্রোজেন

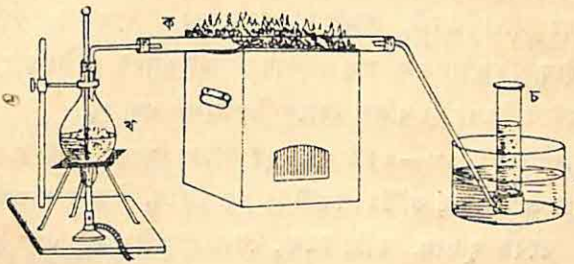
হাইড্রোজেন জলের একটি উপাদান এবং গাছ, পাতা ও জীবজন্তর শরীরে যৌগিক পদার্থের মধ্যে ইহাকে পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন প্রস্তুত প্রণালী—(১) উপরের দিকে দুই মুখওয়ালা বোতলে (woulfe's bottle) কিছু দস্তার টুকরা লও এবং এক মুখে একটি লম্বা নল-ওয়ালা ফানেল এবং অপর মুখে একটি বাঁকা নল কর্কের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পরাইয়া দাও। ঐ ফানেলের নলটি যেন বোতলের তল স্পর্শ করে এবং বোতলের প্রত্যেক মুখেই যেন কর্ক দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। এখন ফানেলের মুখ দিয়া অল্প অল্প করিয়া জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল ও বাঁকা নলের মুখটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। দেখিবে, বোতলের মধ্য হইতে গ্যাস আসিয়া বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করিতেছে। কিছুক্ষণ গ্যাস বাহির হইয়া যাইবার পর কয়েকটি গ্যাস-জার জলে পূর্ণ করিয়া যেখানে গ্যাসের



দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিড সংযোগে হাইড্রোজেন প্রস্তুতপ্রণালী

বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে, সেইখানে উপুড় করিয়া ধর। গ্যাস-জার শীঘ্রই এই গ্যাসে পূর্ণ হইবে এবং জল নিম্নমুখে জার হইতে নামিয়া আসিবে। এইরূপে কতকগুলি জার গ্যাসে পূর্ণ হইলে উহাদের মুখে ঢাকনি দিয়া জল হইতে তুলিয়া রাখ।



লৌহচূর্ণ ও বাষ্পের সাহায্যে হাইড্রোজেন প্রস্তুতপ্রণালী

(২) দুই মুখ খোলা একটি লম্বা পোরসিলেন নলের (ক) মধ্যে কিছু লৌহচূর্ণ রাখিয়া উহার উভয় মুখে এক একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি লাগাইয়া দাও (উপরের চিত্র দেখ)। ঐ পোরসিলেন নলের এক মুখের ছিদ্রে একটি কাচের নল পরাইয়া, কাচের নলের অপর প্রান্ত ছিপিবদ্ধ একটি কাচের ফ্লাস্কের (খ) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। পোরসিলেন নলের অপর মুখের ছিদ্রে আর একটি কাচের নল লাগাইয়া ইহার অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে (গ) ডুবাইয়া রাখ। এখন পোরসিলেন নলটি প্রজ্বলিত উনানের (furnace) উপর বসাইয়া বেশ করিয়া উত্তপ্ত কর। এইবার ফ্লাস্কে (খ) কিছু জল লইয়া প্রজ্বলিত বুন্‌সেন দীপ সাহায্যে জলকে বাষ্পে (steam) পরিণত কর। এই বাষ্প পোরসিলেন নলের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত লৌহচূর্ণের সংস্পর্শে আসিয়া এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন করিবে এবং ইহা বুদ্‌বুদ্‌ আকারে জলপাত্র হইতে উঠিতে থাকিবে। নলের লৌহ আর লৌহ থাকিবে না—উহা জলীয় বাষ্পের (steam) অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক

প্রকার কঠিন অক্সাইডে পরিণত হইবে। জলপাত্রে বুদ্‌বুদ্‌ আকারে যে বায়বীয় পদার্থ বাহির হইতেছে, উহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার (চ) জলপাত্রের উপর উপুড় করিয়া ধর, দেখিবে, এক প্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ গ্যাস জারে জমিতেছে। এই গ্যাসের মধ্যে একটি প্রজ্বলিত কাঠি ধর। প্রজ্বলিত কাঠিটি নিভিয়া যাইবে, কিন্তু গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে। এই গ্যাসই **হাইড্রোজেন** এবং জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **উদজান**ও বলা হয়।

পরীক্ষা (Test)—একটি গ্যাসপূর্ণ জারের মধ্যে প্রজ্বলিত কাঠি ধর, দেখিবে ঐ প্রজ্বলিত কাঠির শিখাটি নিভিয়া যাইবে, কিন্তু গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে। তবেই বুঝিলে, কাঠ, কয়লা, তৈল প্রভৃতির মত এই গ্যাস দাহ্য পদার্থ এবং নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে যেমন শিখাটি নিভিয়া যায়—এক্ষেত্রেও তাই। অতএব ইহা দহনের সহায় নহে। এই গ্যাসটি কি বুঝিলে? ইহা হাইড্রোজেন গ্যাস।

হাইড্রোজেনের ধর্ম—হাইড্রোজেন স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন এবং জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রব হয়। যত প্রকার বায়বীয় পদার্থ আমাদের জানা আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা লঘু এবং লঘু বলিয়াই বেলুন, হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করিলে, আকাশে উড়িয়া যায়। সর্বাপেক্ষা লঘু বলিয়াই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ধরা হয়।

বায়ুতে এই গ্যাস জলে অর্থাৎ জ্বলিবার সময় এই গ্যাস হইল দাহ্য বস্তু এবং বায়ুর অক্সিজেন হইল দহনের সহায়। দহনের সময় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ে মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করে। বায়ুতে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিবার সময় তাপ উৎপন্ন হয় (রাসায়নিক ক্রিয়ার একটি লক্ষণ)। কিন্তু যদি অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন জ্বালানো হয়—তাহাতে এত তাপ উদ্ভূত হয় যে, সেই তাপে লোহা ও অন্যান্য ধাতু অতি সহজেই গলিয়া যায়।

একটি শক্ত বোতল (সোডার বোতল হইলেই ভাল হয়) জলপূর্ণ করিয়া উলটাভাবে জলের মধ্যে রাখিয়া উহার ⅓ অংশ অক্সিজেন ও অপর ⅔ অংশ হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ কর। এখন বোতলের মুখে ছিপি দিয়া, উহাকে জল হইতে তোল এবং ছিপিটি খুলিয়া বোতলের মুখ প্রজ্বলিত শিখার সম্মুখে ধর, তৎক্ষণাৎ খুব জোরে শব্দ হইবে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ : ১ আয়তনে সংযুক্ত হইয়া এরূপ শব্দ হইল এবং কিছু জলও হইল, তবে জলের পরিমাণ এত সামান্য যে তাহা লক্ষ্য হইবে না।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার—হাইড্রোজেন গ্যাস বেলুন ও এরোপ্লেন উড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অধিক পরিমাণে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিবার কার্যেও ইহার ব্যবহার আছে।



হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ : ১ অনুপাতে পুরিয়া বোতলটি শিখার সম্মুখে ধরায়, জোরে শব্দ হইল

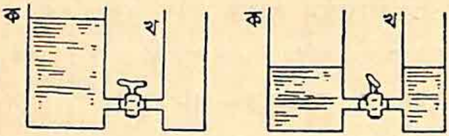
অক্সিজেনের সাহায্যে ধাতু জুড়িবার (welding) বা গলাইবার জন্য এবং উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে কৃত্রিম ঘৃত (vegetable product) প্রস্তুতের জন্যও ইহার ব্যবহার হয়।

জলের তল-সম (সমোচ্চশীলতা) হইবার প্রচেষ্টা—জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থের একটি স্বাভাবিক ধর্ম এই যে উহাদের **উপরিভাগ সব সময় সমতল** (plane) ও **ভূসমান্তরাল** (horizontal) **থাকে**। গ্লাসের জল, কলসীর জল, চৌবাচ্চার জল এবং

সাধারণ অবস্থায় সমস্ত জলাশয়ের জলের উপরিভাগ সমতল ও ভূসমান্তরাল। গ্লাস কাত করিলে দেখা যায়, উহার ভিতরকার জলের উপরিভাগ সমতল ও ভূসমান্তরালই রহিয়াছে।

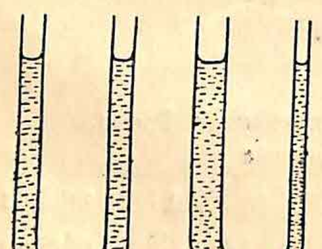
নীচের চিত্রে মোটা 'ক' পাত্রটি, সরু 'খ' পাত্রটির সঙ্গে পেঁচকল দ্বারা সংযুক্ত আছে। পেঁচকল বন্ধ করিয়া মোটা পাত্রটি জলে পূর্ণ করা হইল।

মোটা 'ক' পাত্রটি জলে পূর্ণ করা হইল

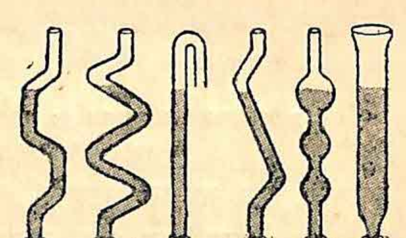


জল উঁচু হইতে নীচুতে নামিয়া দুই পাত্রে এক সমতলে রহিল

এখন পেঁচকল খোলামাত্র দেখা যাইবে, জল মোটা পাত্র হইতে সংযোগ-নলের মধ্য দিয়া সরু পাত্রে যাইতেছে এবং কিছুকাল পরেই দুই পাত্রের জলের উপরিভাগ এক সমতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। **নল দ্বারা বা অন্যভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন পাত্রের কোন একটিতে জল ঢালিলে প্রত্যেকটি পাত্রের জলের উপরিভাগ এক সমতলে থাকিবে।** সমস্ত তরল পদার্থেরই এইরূপ হইয়া থাকে।



U-নলের দুই বাহুরই জলের উপরিভাগ সমান



বিভিন্ন আকৃতির প্রত্যেক পাত্রেই জলের উপরিভাগ সমান

কোন U-আকৃতির কাচ-নলের এক বাহুর মধ্যে জল ঢালিলে দেখা যায় জল দুই বাহুর মধ্যেই সমান উঁচুতে উঠিয়া এক সমতলে দাঁড়ায়।

এক বাহু মোটা অপর বাহু সরু, অর্থাৎ এক বাহুর ছেদ-আয়তন অন্য বাহুর ছেদ-আয়তন হইতে বড় হইলেও অন্যথা ঘটে না।

চিত্রে প্রদর্শিত (৩৮ পৃষ্ঠার চিত্র) পরস্পর সংযুক্ত পাত্রগুলির যে-কোন একটিতে জল ঢালিলে দেখা যায়, সবগুলিতেই জল সমান উঁচুতে উঠিয়াছে, এবং বিভিন্ন পাত্রের আকার ও আয়তন অনুযায়ী, বিভিন্ন পরিমাণের জল পাত্রগুলিতে প্রবেশ করিলেও প্রত্যেক পাত্রে জলের উপরিভাগ এক সমতলে দাঁড়াইয়া আছে।

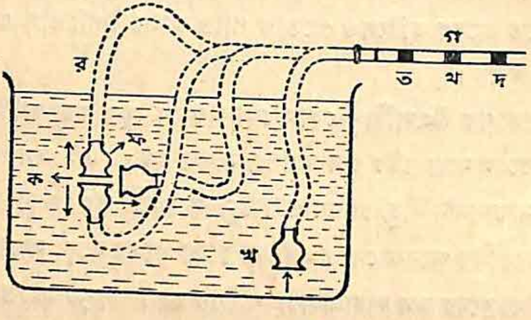
প্রস্রবণের উৎপত্তি—কোন কোন স্থানে ভূত্বকের অভ্যন্তরে জল-নিরোধী স্তরের মধ্যে বৃষ্টির জল আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই জলস্তরগুলি সম-তল নয়, মাঝখানটা নীচু, চারিপাশটা উঁচু, অনেকটা বড় কড়াইয়ের মত। এই জলস্তরগুলির অনেক ক্ষেত্রে নদী বা হ্রদের জলের সঙ্গে সংযোগ থাকে, এবং নদী বা হ্রদের জল দ্বারা ইহারা পরিপুষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই জল-নিরোধী স্তরের তলা পর্যন্ত ছিদ্র করিলে ছিদ্রমুখ দিয়া সরবরাহ কেন্দ্রের সমতল না হওয়া পর্যন্ত জল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। সরবরাহ কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে থাকিলে এই প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে। এইরূপ ছিদ্রপথকে অর্টেসীয় কূপ বলা হয়। জলের সমোচ্চশীলতা ধর্মের উপরই ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ভর করে।

অনেক সময় জলনিরোধী স্তরগুলির উপরের ভূত্বকে নানা নৈসর্গিক কারণে ফাটল ধরে বা আপনা হইতেই ছিদ্রপথ রচনা হয়, ফলে আবদ্ধ জল খোলা পাইয়া বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহারই নাম প্রস্রবণ। সরবরাহ কেন্দ্র খুব উঁচুতে থাকিলে প্রস্রবণ অবিরাম সক্রিয় থাকে।

জলের চাপ উহার গভীরতার উপর নির্ভর করে—

পরীক্ষা—(১) একটি কাচের ফানেলের খোলা মুখ পাতলা রবার দিয়া মুড়িয়া নিতে হইবে। ফানেল-সংলগ্ন সরু ছোট নল রবার টিউবের সাহায্যে একটি সরু মুখওয়ালা লম্বা কাচনলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল। এই

সরু কাচনলের মধ্যে খানিকটা লাল রং গোলা জল প্রবেশ করাইলে উহা নলের মধ্যে একটি রেখার আকারে অবস্থান করিয়া থাকিবে। এই লাল রেখার অবস্থান জলের চাপের পরিমাণ বুঝাইয়া দিবে বলিয়া ইহাকে নির্দেশক রেখা বলা যাইতে পারে। এক্ষণে চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে একটি বড় কাচপাত্রে

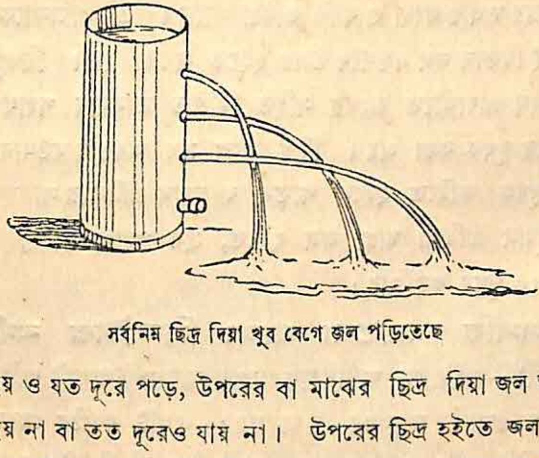


জলের চাপের পরীক্ষা

জল ভরিয়া রবার দ্বারা মোড়ানো কাচের ফানেলটি ঐ জলের মধ্যে 'ক' বিন্দু অবধি ডুবানো হইল। দেখা যাইবে নির্দেশক রেখা ডান দিকে 'ত' হইতে 'থ'-এ সরিয়া গিয়াছে। ফানেলটি যদি 'ক'-এর নীচে 'খ' বিন্দু অবধি ডোবানো হয় তবে দেখা যাইবে নির্দেশক রেখা আরও একটু ডান দিকে সরিয়া 'দ'-এ গিয়াছে। জলের চাপে ফানেল-সংলগ্ন রবার ভিতরের দিকে চলিয়া যায় এবং ফানেলের মধ্যে আবদ্ধ বায়ুতে চাপ দেয়, এই চাপ সঞ্চারিত হইয়া কাচনলস্থ নির্দেশক রেখাকে ডান দিকে সরাইয়া দেয়। রবারের উপর জলের চাপ যত বেশী হইবে, ফানেলের ভিতরের বায়ু নির্দেশক রেখাকে তত দূরে ঠেলিয়া দিবে। উপরের পরীক্ষায় দেখা যায়, **জলের চাপ গভীরতার বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ে।** 'খ'-এর গভীরতা 'ক'-এর গভীরতার চেয়ে বেশী বলিয়া রবারের উপর জলের অধিকতর চাপ প্রযুক্ত হয় ফলে নির্দেশক রেখা আরও দূরে চলিয়া যায়।

এক্ষণে ফানেল-সংলগ্ন রবার যে-কোন নির্দিষ্ট বিন্দু যেমন 'ক'-তে রাখিয়া ফানেলটি ঘুরাইয়া যে-কোন ভাবে স্থাপন করিলে দেখা যায়, নির্দেশক রেখা প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই জায়গায় 'খ'-এ গিয়া অবস্থান করে। **ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় কোন নির্দিষ্ট গভীরতায় জলের চাপ সকল দিকে সমান।**

(২) **জলের পার্শ্বচাপ**—নীচের চিত্রে একটি লম্বা টিনের পাত্র দেখ। উহার একপার্শ্বে বিভিন্ন উচ্চে তিনটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রগুলি ছিপি দিয়া আঁটিয়া জলে ভরতি কর এবং উপরকার তিনটি ছিপি একে একে আলগা করিয়া দাও। দেখ, জলের পার্শ্বচাপে ছিপিগুলি ছিটকাইয়া পড়িল এবং প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আরও লক্ষ্য কর, পাত্রের নীচেকার ছিদ্র হইতে ছিপি খুলিয়া দিলে, জল যত জোরে ছিদ্র দিয়া



সর্বনিম্ন ছিদ্র দিয়া খুব বেগে জল পড়িতেছে

বাহির হয় ও যত দূরে পড়ে, উপরের বা মাঝের ছিদ্র দিয়া জল তত বেগে বাহির হয় না বা তত দূরেও যায় না। উপরের ছিদ্র হইতে জল সবচেয়ে কম বেগে বাহির হয়। এই পরীক্ষাতেও জানা গেল, জলের চাপের মাত্রা গভীরতার উপর নির্ভর করে।

জল দূষিত হইবার কারণ—নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক উভয় কারণেই জল দূষিত হইতে পারে। খাল, বিল, নদী, পুকুর প্রভৃতির

জলে নানা প্রকারের মাটি, কাঁকর, বালি, নানা জাতীয় ধাতব লবণ প্রভৃতি দ্রব অবস্থায় মিশিয়া থাকার দরুণ ঐ সমস্ত জল নানা অনৈসর্গিক কারণেও দূষিত হয়। খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির জলে স্নান করা, কাপড়-চোপড় কাচা, পশুপক্ষী স্নান করানো প্রভৃতি কারণে উহাদের জল দূষিত হয়। এইরূপ দূষিত জলে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের জীবাণু বর্তমান থাকে।

দূষিত জল শোধনের উপায়—নদী বা পুকুরের জলের সঙ্গে মাটি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি অথবা নানাপ্রকার লবণ-জাতীয় জিনিস দ্রব অবস্থায় মিশিয়া থাকিলে ঐ জল দূষিত হয়। দূষিত জলকে নানাভাবে শোধন করা যায়। বালি ও মাটি-মিশ্রিত জল একটি পাত্রে ভরিয়া রাখিলে ২।৩ দিন বাদে দেখা যায় উপরের জল পরিষ্কার হইয়াছে এবং পাত্রের তলায় কাদা ও বালি জমিয়া আছে। এই প্রক্রিয়াকে **থিতান** বলে। এই থিতান জল সন্তর্পণে উপর হইতে লওয়া হয়। **ফিল্‌টার** বা **পরিস্রাবণ** প্রণালীতে জলের সহিত মিশ্রিত ভাসমান পদার্থগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায়। কিন্তু জলে দ্রব অবস্থায় বর্তমান পদার্থগুলিকে পৃথক করিতে হইলে পাতন বা চুয়ান প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়। চুয়ান প্রক্রিয়া দ্বারা জল হইতে, দ্রব পদার্থ ছাড়া, ভাসমান পদার্থগুলিও পৃথক করা যায়।

কলসীর সাহায্যে জল ফিল্‌টার করিবার প্রণালী—পল্লীগ্রামে অপরিষ্কার জলকে পানের উপযোগী করিবার জন্য একপ্রকার প্রণালী অবলম্বন করা হয়। একটি কাঠের ফ্রেমে উপরি উপরি চারিটি মাটির কলসী সাজানো থাকে, উপরের তিনটির তলায় ছিদ্র করা থাকে। সর্বোপরি কলসীতে কিছুই থাকে না, দ্বিতীয় কলসীতে প্রায় আধাআধির মত কাঠকয়লা চূর্ণ থাকে, তৃতীয়টিতে সূক্ষ্ম বালু এবং ছোট ছোট পাথরের নুড়ি থাকে আর চতুর্থ কলসীটি সবচেয়ে নীচে থাকে।

যে জল ফিল্টার করিতে হইবে তাহা উপরের প্রথম কলসীতে ঢালা হইল, নীচেকার ছিদ্র দিয়া ঐ অপরিষ্কার জল কাঠকয়লাপূর্ণ দ্বিতীয় কলসীর ও পরে বালুকণা ও নুড়িপূর্ণ তৃতীয় কলসীর মধ্য দিয়া গড়াইয়া সর্বশেষ কলসীতে আসিয়া জমিবে। জল এইরূপ ভাবে গড়াইয়া আসিবার সময় উহাতে যে ভাসমান ময়লা থাকে তাহা কাঠকয়লা ও বালুকণার ভিতর আটকাইয়া যায় এবং সবচেয়ে নীচের কলসীতে পরিষ্কার জল আসিয়া জমে।

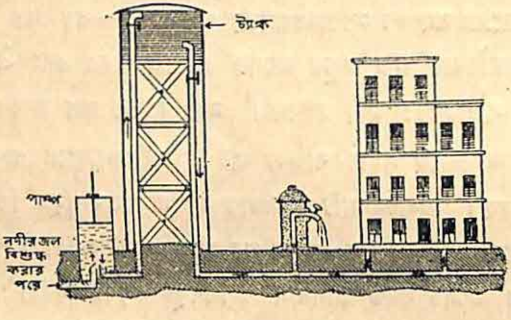
শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা—বড় বড় শহরে জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় এবং ঐ জল সংগ্রহ করা হয় সাধারণতঃ নদী হইতে। নদী হইতে জল কতকগুলি কৃত্রিম অগভীর জলাধারে লইয়া যাওয়া হয়। এই জলাধারে প্রথমে ফটকিরি মিশানো হয়। এখানে মাটি ও অন্যান্য ভাসমান দ্রব্যসমুহ থিতাইয়া যায় এবং উপরের পরিষ্কার জল একটির পর আর একটি জলধারে লইয়া যাওয়া হয়, ফলে জলের সমস্ত ভাসমান পদার্থসমূহ পৃথক হইয়া যায়। এই বিশাল জলাধারগুলির জল সূর্যের আলোতেও কিছুটা জীবাণুমুক্ত হইয়া যায়। সর্বশেষ জলাধারটিকে পরিস্রুতি-আধার বলা হয়। এই আধারে



অধিক পরিমাণে জল ফিলটার করিবার প্রণালী

প্রথমস্তরে মিহি বালি, তাহার নীচের স্তরে মোটা বালি, তাহার নীচে কাঁকর ও ছোট ছোট পাথরের নুড়ি থাকে। জল এই সমস্ত স্তর দিয়া নীচে নামিয়া আসে এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় আধার-সংলগ্ন মোটা

পাইপের সাহায্যে বাহির হইয়া আসে। ঐ জলকে পাম্প করিয়া খুব উঁচু ও দৃঢ় মঞ্চের উপর রক্ষিত একটি সুবৃহৎ আধার বা ট্যাঙ্কে আনা হয়। ট্যাঙ্কের উপরদিকে একটি মোটা নল এবং নীচের দিকে আর একটি মোটা নল সংযুক্ত করা হয়। জলাশয়ের জল প্রয়োজন মত বিশুদ্ধ করিয়া পাম্পের সাহায্যে উপরের নলটির মধ্য দিয়া তুলিয়া ট্যাঙ্কটি জলপূর্ণ করা হয়। ট্যাঙ্কের নীচের নলটির সহিত রাস্তার তলায় স্থাপিত মোটা



শহরে জল সরবরাহ

পাইপের যোগ আছে। এই রাস্তার পাইপের সঙ্গে আবার বাড়ী ও রাস্তা ঘাটের উপর বসানো কলের সরু পাইপের সংযোগ থাকে। জলপূর্ণ ট্যাঙ্কের নীচের নলের প্যাঁচকল খুলিয়া দিলে জল আধার হইতে নীচে নামিয়া আসে এবং রাস্তার তলায় স্থাপিত পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বসানো কলের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে উপরের ট্যাঙ্ক হইতে রাস্তার কলের মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবার মূলে রহিয়াছে জলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম। ট্যাঙ্ক হইতে যদি জল বাহির হইবার কল উঁচু হয়, তাহা হইলে কল দিয়া জল বাহির হইবে না।

আয়তন, ভর, ভার ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

(Volume, mass, weight, density and specific gravity)

আয়তন (volume)—পৃথিবীতে সর্বপ্রকার বস্তু কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেই। **কোন বস্তু যতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহার পরিমাপকেই সেই বস্তুর আয়তন বলা হয়।**

গাণিতিক নিয়মে আয়ত ক্ষেত্র বা সামান্তরিক ক্ষেত্র বিশিষ্ট কোন বস্তুর আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা।

মনে কর একটি আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৩ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ২ সেন্টিমিটার, অতএব উহার আয়তন হইবে, দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = ৫ সে.মি. × ৩ সে.মি. × ২ সে.মি. = **৩০ ঘন সেণ্টিমিটার।** সেন্টিমিটারের পরিবর্তে ইঞ্চি বা ফুট একক ধরিয়া **ঘন ইঞ্চি** বা **ঘন ফুট** লেখা যায়।

ভর (mass)—**কোন জিনিসের মধ্যে যতখানি জড় পদার্থ থাকে তাহাকে উহার ভর বা বস্তু-পরিমাণ বলে।** ভরকে পাউণ্ড, গ্রাম প্রভৃতি এককে প্রকাশ করা হয়।

ওজন বা ভার (weight)—পৃথিবী উহার উপরকার সমস্ত জিনিসকে একটা বিশেষ শক্তির দ্বারা নিজের কেন্দ্রের দিকে সর্বদা আকর্ষণ করে। ইহাকে পৃথিবীর **মাধ্যাকর্ষণ** (gravitation) বলে। পৃথিবীর এই আকর্ষণের জন্য আকাশে আশ্রয়শূন্য অবস্থায় সমস্ত জিনিস মাটির দিকে পড়িয়া যায়। **যতটা বল** (force) **লইয়া বস্তুটি মাটির দিকে পড়িয়া যায় উহাই হইল বস্তুটির ওজন** (weight)। তোমার হাতের উপর একখানি বই রাখিলে যে চাপ অনুভব কর উহার দ্বারাই বই-খানির ওজনের ধারণা হইয়া থাকে। মাথায় একটা বোঝা চাপাইলে যে

ভার বোধ কর উহা ঐ বোঝার ওজনের জন্য। বোঝাটি বেগে নীচের দিকে যাইতে চায়। তোমার মাথা বাধা দিয়াছে বলিয়া বোঝাটির ঐ বেগ তোমাকে অনুভব করিতে হয়। কোন পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশী হইলে উহা বেশী বেগে মাটির দিকে পড়িয়া যায়, অর্থাৎ উহার ওজন বেশী হয়।

ওজন বা ভারের গাণিতিক ব্যাখ্যা—পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা সমস্ত বস্তুকে তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ফলে কোন বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের যত নিকটে আসিতে থাকে, ইহার গতিবেগের মাত্রাও তত তরান্বিত হইতে থাকে।

আকর্ষণ-জনিত গতিবেগের এইরূপ ত্বরিত হাওয়ার নাম নিয়ত-ত্বরণ বা অভিকর্ষজ ত্বরণ (acceleration due to gravity)। ইংরাজী 'g' অক্ষর দ্বারা এই অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিমাপ প্রকাশ করা হয়।

এক্ষণে কোন বস্তুর ওজন বুঝিতে আমরা বুঝি সেই বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি এবং বস্তুর ভর যত বৃদ্ধি পাইবে উহার উপর আকর্ষণের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং ওজনও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অতএব কোন বস্তুর ভর যদি হয় m এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ হয় g, তাহা লইলে সেই বস্তুর ওজন (W) হইবে $m \times g$, অর্থাৎ $W = m \times g$।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আকর্ষণের মাত্রাও বিভিন্ন অতএব 'g'-এর মানও পরিবর্তনশীল। **অতএব বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।** 'g'-এর হ্রাস বা বৃদ্ধিতে ওজনেরও হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ওজন ও ভরের তুলনা—উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলে যে, পদার্থের ওজন ও ভর এক নহে। জিনিসের ভর বেশী হইলে উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্রাও বেশী হয় কাজেই উহার ওজনও বাড়ে। আবার ভূপৃষ্ঠ হইতে জিনিসটির দূরত্বের উপর উহার ওজন নির্ভর করে। জিনিসটি ভূপৃষ্ঠ হইতে যত দূরে থাকিবে উহার ওজন

তত কম হইবে কারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে দূরে থাকার দরুন উহার উপর আকর্ষণের মাত্রাও কম হয়। **সমুদ্রতীরে কোন পদার্থের যাহা ওজন, তাহার অপেক্ষা অনেক কম হয় পাহাড়ের উপরে।** কিন্তু জিনিসের **ভর সবক্ষেত্রেই সমান থাকে।**

কঠিন, তরল ও বায়বীয় সমস্ত পদার্থেরই ওজন আছে।

ঘনত্ব (density)—**প্রতি একক আয়তনে কোন বস্তুর যতটা ভর থাকে উহাকে উহার ঘনত্ব বলা হয়।** এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের কাচের ভর হইল ২·৫ গ্রাম। অতএব কাচের ঘনত্ব হইল ২·৫ গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। এক ঘনফুট জলের ভর হইল ৬২·৫ পাউণ্ড। অতএব জলের ঘনত্ব হইল ৬২·৫ পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে। সেন্টিমিটার এককে জলের ঘনত্ব হইল ১ গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

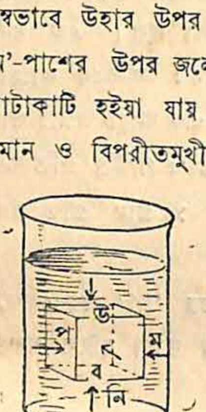
সাধারণ গাণিতিক হিসাবে যদি কোন বস্তুর ভর 'M' ভর-একক, আয়তন 'V' আয়তন-একক এবং ঘনত্ব 'd' হয় তাহা হইলে ঘনত্ব

$d = \frac{M}{V}$ ভর-একক প্রতি আয়তন-এককে।

আর্কিমিডিসের সূত্র (Archimedes Principle)—একটা ভারী খুঁটি জলে ডুবানো থাকিলে যে কেহ একলাই উহাকে অতি সহজে জলের মধ্য দিয়া টানিয়া লইতে পারে। কিন্তু খুঁটিটি ডাঙ্গায় তুলিলে উহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুই-তিন জন লোকের পক্ষেও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জলপূর্ণ কলসী বহন করিয়া লইতে বেশ কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু উহাকে শুধু দুইটি আঙ্গুলের সাহায্যে জলের ভিতরে নাড়াচাড়া করা সম্ভব। ইহাতে বুঝা যায় যে, বস্তুমাত্র জলে ডুবাইলে অনেক হালকা হইয়া যায়। কতখানি এবং কি কারণে হালকা বোধ হয়, নীচের আলোচনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ, জল বা কোন তরল পদার্থের ভিতরকার কোন জায়গায় উহার চাপ উহার গভীরতার উপর নির্ভর করে এবং ঐ চাপ উর্ধ্বে, নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে লম্বভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এখন একটি নূতন জিনিস বুঝিতে চেষ্টা কর।

জলের প্লবতা (Buoyancy)—নীচের চিত্রে একখানা সমচতুষ্কোণ ধাতুখণ্ড জলে ডুবানো আছে। চতুর্দিক হইতে জলের চাপ, লম্বভাবে উহার উপর পড়িতেছে। 'প'-পাশের উপর জলের চাপ 'ম'-পাশের উপর জলের চাপের সমান। ইহারা বিপরীতমুখী বলিয়া কাটাকাটি হইয়া যায়। তেমনি 'ব' ও 'ভ'-পাশের উপর জলের চাপ সমান ও বিপরীতমুখী বলিয়া উহারাও কাটাকাটি হইয়া যায়। কাজেই ধাতুখণ্ডখানি কোন পাশের দিকে সরিয়া যায় না। এখন বাকি রহিল ধাতুখণ্ডের উপরকার 'উ'-তলের উপর জলের নিম্নচাপ, আর নীচেকার 'নি'-তলের উপর জলের ঊর্ধ্বচাপ। ধাতুখণ্ডের 'উ'-র গভীরতা 'নি'-র গভীরতার চেয়ে কম। কাজেই জলের ঊর্ধ্বচাপ জলের নিম্নচাপের চেয়ে বেশী। ফলে নিম্নচাপের ক্রিয়া ও ঊর্ধ্বচাপের ক্রিয়া উভয়েই কাটাকাটির পরও, জলের খানিকটা উর্ধ্বচাপ থাকিয়া যাইবে। জলের এই বাকি উর্ধ্বচাপের পরিমাণ বাহির করা যায়। ধাতুখণ্ডের 'উ'-র উপর হইতে জলের সমতল অবধি যতখানি জল লম্বভাবে দাঁড়ায়, উহার ওজন নিম্নচাপের সমান। আচ্ছা, এই ওজন ধর 'ক'। আবার ধাতুখণ্ডের 'নি'-র উপর হইতে জলের সমতল পর্যন্ত যতখানি জল দাঁড়ায়, উহার ওজন ঊর্ধ্বচাপের সমান। মনে কর এই ওজন হইল 'খ'। 'খ' হইতে ক' বাদ দিলে, আমরা পাই ধাতুখণ্ডখানি যতটুকু জল সরাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ নিজ আয়তন পরিমিত জলের ওজন। এই ওজনই



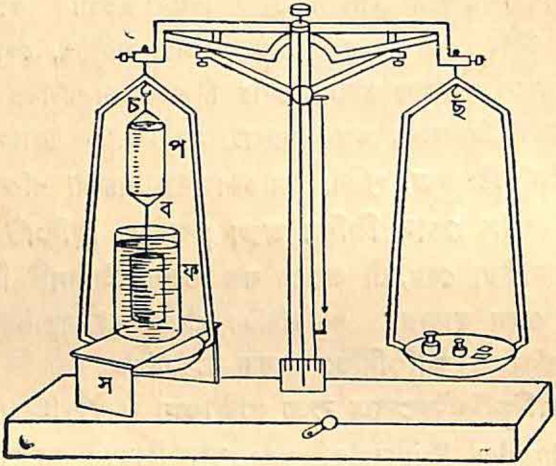
জলের প্লবতা

জলের বাকি উর্ধ্বচাপের সমান নয় কি ? এইরূপে দেখা যায়, কোন কঠিন জিনিস জলে ডুবাইলে উহার নিজের আয়তন পরিমিত জল সরিয়া পড়ে এবং উহারই ওজনের সমান জলের একটি উর্ধ্বচাপ জিনিসটিকে উপরে ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। **জলের এই বিশেষ ধর্মের নাম প্লবতা।** অন্যান্য তরল পদার্থেরও প্লবতা ও উর্ধ্বচাপ আছে।

কোন পদার্থ জলে ডুবাইলে উহার ওজন কতখানি কমে, এখন তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব। একটু আগেই জানিয়াছ, কোন কঠিন জিনিস জলে নিমজ্জিত হইলে, উহার নিজ আয়তন পরিমিত জল স্থান-চ্যুত হয়। ঐ জলের ওজন অনুযায়ী যতটা শক্তি উহাকে উপরে ভাসাইতে চেষ্টা করে, পৃথিবীর আকর্ষণজনিত নিম্নমুখী শক্তি ততখানি কমে। অর্থাৎ **কোন জিনিস জলে ডুবাইলে জিনিসটি যতখানি জল সরাইয়া দেয়, ঐ জলের যত ওজন, জিনিসটি ঠিক ততখানি ওজন হারায়।** আর্কিমিডিস প্রথমে এই সত্যটি আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহা **আর্কিমিডিসের সূত্র** নামে পরিচিত।

আর্কিমিডিসের সূত্র পরীক্ষা (Verification of Archimedes Principle)—৫০ পৃষ্ঠার চিত্রের অনুরূপ একটি তুলাদণ্ড লও। উহার দুই বাহুপ্রান্তের নীচে 'চ', 'ছ' দুইটি হুক আছে। 'চ' হুক হইতে একটি ফাঁপা পিতলের চোঙ (প) ঝুলাও এবং পিতলের চোঙের নীচেকার অংশ (ব) হইতে আর একটি নিরেট লম্বা চোঙ (ফ) ঝুলাইয়া দাও। 'ফ' চোঙটি 'প' চোঙের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, অর্থাৎ 'প' চোঙের ভিতরকার আয়তন ঠিক 'ফ' চোঙের আয়তনের সমান। একটি কাঠের সেতু (স) বাম পাল্লার উপর দিয়া বসাও, যেন উহা পাল্লার কোথাও না ঠেকে ; সেতুর উপর একটি শূন্য কাচপাত্র রাখ। 'ফ' চোঙটি উহার মধ্যে আলগাভাবে ঝুলিতে দাও। এখন অপর পাল্লায় ওজন বসাইয়া তুলাদণ্ডের দুইদিক

সমভারযুক্ত কর। তারপর কাচপাত্রের মধ্যে জল ঢাল, যেন 'ফ' চোঙ সবটা ডুবিয়া যায়। জলের ঊর্ধ্বচাপ 'ফ' চোঙকে জলের উপরের দিকে ঠেলিবে, কাজেই উহার ওজন কমিয়া যাইবে। এইজন্য ডান দিকের পাল্লা নীচের দিকে নামিয়াছে দেখিবে। এখন ফাঁপা 'প' চোঙে জল ঢাল। যখন উহা ঠিক ভরতি হইবে, তখন দেখিবে তুলাদণ্ডের



আর্কিমিডিসের সূত্র পরীক্ষা

দুই পাল্লা সমভারযুক্ত হইয়া ঝুলিতেছে। এখানে ফাঁপা চোঙের আয়তন নিরেট চোঙের আয়তনের সমান। অতএব প্রমাণ হইয়া গেল, **জলে নিমজ্জিত অবস্থায় 'ফ' চোঙের ওজন যতখানি কমে 'ফ' চোঙ দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন তাহার সমান।**

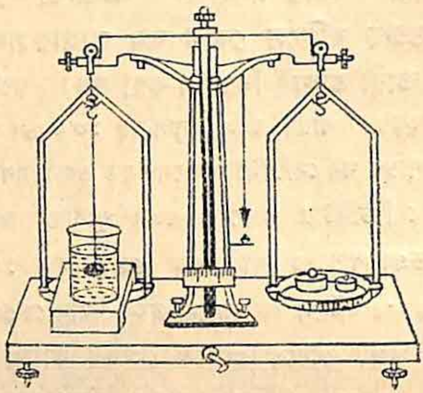
আর একটি পরীক্ষা সহজে করিতে পার। একটি পাথরের টুক্‌রা বাতাসে ওজন কর। এখন জলে নিমজ্জিত অবস্থায় উহার ওজন লও। তারপরে গা-নল (side-tube)-যুক্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে পাথরটি ফেলিয়া দিলে উহা দ্বারা স্থানচ্যুত সমায়তন জল গা-নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

ঐ জল একটি গ্লাসে সংগ্রহ করিয়া উহার ওজন বাহির কর। দেখ, জলের ভিতর পাথরখণ্ড ওজন করাতে ওজন যতটুকু কমিয়াছিল সমায়তন জল স্থানচ্যুত হইয়া গ্লাসে যে জল জমিল, উহার ওজন ঠিক একই।

পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব—কোন বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলিলে কোন বস্তু তাহার সমায়তন জলের চেয়ে কতগুণ ভারী তাহাই নির্দেশ করা হয়। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ধরা হয়। পারদ জলের তুলনায় ১৩·৬ গুণ ভারী। অর্থাৎ এক, দশ বা পঁচিশ ঘন সেন্টিমিটার জলের যত ওজন, যথাক্রমে এক, দশ বা পঁচিশ ঘন সেণ্টিমিটার পারদের ওজন পূর্বোক্ত জলের ওজনের ১৩·৬ গুণ। অতএব পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হইল ১৩·৬। কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৫ বলিলে এই বুঝানো হয়—সমান যে-কোন আয়তনের কাচখণ্ড ও জল ওজন করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কাচের ওজন জলের ওজনের ২·৫ গুণ হইবে। বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন মাপের আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে, কেননা একই আয়তন বিশিষ্ট বিভিন্ন পদার্থের ওজন বিভিন্ন।

কোন পদার্থের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি যথাক্রমে 'ঘ' ও 'স' হয় এবং জলের ঘনত্ব হয় $\textbf{ঘ}_{জ}$, তবে উহাদের মধ্যে যে একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে তাহা হইল—$\textbf{ঘ} = \textbf{স} \times \textbf{ঘ}_{জ}$। সেন্টিমিটার এককে $\textbf{ঘ}_{জ} = ১$ গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে, অতএব এই এককে পদার্থের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইঞ্চি-পাউণ্ড এককে জলের ঘনত্ব ৬২·৫ পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে অতএব এই এককে পদার্থের ঘনত্ব উহার আপেক্ষিক গুরুত্বকে ৬২·৫ দ্বারা গুণ করিলে পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, ঘনত্বের একটা একক আছে, যেমন—গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার, অথবা পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুট ইত্যাদি। **কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব একটি সংখ্যা মাত্র, ইহার কোন একক নাই।**

জলে অদ্রাব্য কঠিন ও ভারী পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়—সাধারণ তুলাদণ্ডের সাহায্যে নির্দিষ্ট কঠিন বস্তুটির ওজন লওয়া হইল। মনে কর এই ওজন = W গ্রাম।



জলে নিমজ্জিত অবস্থায় ওজন লওয়া

এক্ষণে চিত্র অনুযায়ী বস্তুটির জলে নিমজ্জিত অবস্থায় ওজন লওয়া হইল। মনে কর এই ওজন = W_1 গ্রাম।

এক্ষণে $W - W_1$ = পদার্থটির সমায়তন পরিমিত জলের ওজন (আর্কিমিডিসের সূত্র)।

$$\text{অতএব পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{পদার্থটির নির্দিষ্ট আয়তনের ভার}}{\text{পদার্থটির সমায়তন পরিমিত জলের ভার}}$$

$$= \frac{W}{W - W_1}$$

এখানে আপেক্ষিক গুরুত্বের যে সূত্র দেওয়া হইল উহা জলের চরম (maximum) ঘনত্বের (density) উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে। ৪ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জল চরম ঘনত্ব দশা প্রাপ্ত হয়।

পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত আপেক্ষিক গুরুত্বের সহিত ঐ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব দ্বারা গুণ করিলেই পদার্থের যথার্থ আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে আর একটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব এবং ৪ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব প্রায় সমানই থাকে ; অতএব পরীক্ষাগারের প্রাপ্ত ফলকে সাধারণভাবে নির্ভুল বলা যাইতে পারে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্বের সহিত সম্পর্ক— মনে কর কোন পদার্থের আয়তন V, ভর M, ঘনত্ব d এবং সম-আয়তন জলের ভর M_1 এবং জলের ঘনত্ব d_1।

এক্ষণে পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনের ভার $= M \times g$ এবং সম-আয়তন পরিমিত জলের ভার $M_1 \times g$ (৪৬ পৃষ্ঠায় দেখ)।

$$\text{কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{পদার্থটির নির্দিষ্ট আয়তনের ভার}}{\text{পদার্থটির সম-আয়তন পরিমিত জলের ভার}}$$

$$= \frac{M \times g}{M_1 \times g} = \frac{M}{M_1}$$

$$= \frac{\text{পদার্থের ভর}}{\text{সমায়তন জলের ভর}}$$

আবার পদার্থের ঘনত্ব $= \frac{M}{V}$ এবং জলের ঘনত্ব $= \frac{M_1}{V}$ (৪৭ পৃষ্ঠায় দেখ)

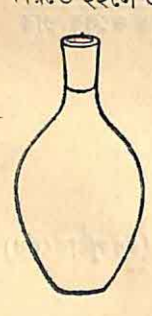
অর্থাৎ $d = \frac{M}{V}$ এবং $d_1 = \frac{M_1}{V}$

$$\text{অতএব আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{M}{M_1} = \frac{\frac{M}{V}}{\frac{M_1}{V}} = \frac{d}{d_1}$$

$$\text{অর্থাৎ কোন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{পদার্থের ঘনত্ব}}{\text{জলের ঘনত্ব}}$$

ঘনত্বের একক—আপেক্ষিক গুরুত্বের কোন একক নাই কিন্তু ঘনত্বের একক আছে, সেন্টিমিটার (centimetre), গ্রাম (gramme) ও সেকেণ্ড (second) অথবা সি. জি. এস. ; এবং ফুট (foot), পাউণ্ড (pound), সেকেণ্ড (second) অথবা এফ্. পি. এস.। সি. জি. এস. পদ্ধতিতে জলের ঘনত্ব = এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন অর্থাৎ এক গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। অনুরূপ ভাবে এফ্. পি. এস. পদ্ধতিতে জলের ঘনত্ব = এক ঘন ফুট জলের ওজন = ৬২.৫ পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে।

তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ঃ
(১) **গুরুত্বমান বোতল** (Specific gravity bottle) **দ্বারা**—যে সমস্ত তরল পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হয় না এবং যাহা শীঘ্র উবিয়া যায় না (Non-volatile) এইরূপ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইলে এক প্রকার ছোট ধরনের দাগ কাটা বোতল ব্যবহার করা হয়। উহাকে গুরুত্বমান বোতল বলে। চিত্রে প্রদর্শিত **নির্দিষ্ট আয়তনের** বোতলটির মুখে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত কাচের ছিপি আছে। উহা কেবল মাত্র নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত যাইতে পারে। বোতলটিকে প্রথমে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া শুকাইয়া খালি অবস্থায় উহার ওজন লওয়া হইল। পরে যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিতে হইবে তাহার দ্বারা পূর্ণ করা হইল। এক্ষণে ছিপি বন্ধ করিলে নির্দিষ্ট দাগ হইতে অধিক মাত্রার তরল পদার্থ ছিপির ঐ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যাইবে। তরল পদার্থপূর্ণ এই বোতলটির ওজন লওয়া হইল। পুনরায় তরল পদার্থ বাহির করিয়া বোতল পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া এবং শুকাইয়া উহাতে অনুরূপ ভাবে জল পূর্ণ করা হইল এবং জলপূর্ণ


গুরুত্বমান বোতল

বোতলের ওজন লওয়া হইল। তরল পদার্থের নমুনা হিসাবে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে হিসাব করা যায়—

মনে কর নির্দিষ্ট দাগ অবধি বোতলটির আয়তন = V ঘ. সে.

বোতলটির খালি অবস্থার ওজন = W_1 গ্রাম

„ জল পূর্ণ অবস্থার ওজন = W_2 „

„ কেরোসিন তৈলপূর্ণ অবস্থায় বোতলটির ওজন = W_3 গ্রাম

অতএব $W_3 - W_1$ = (নির্দিষ্ট) V ঘন সেন্টিমিটার কেরোসিনের ওজন।

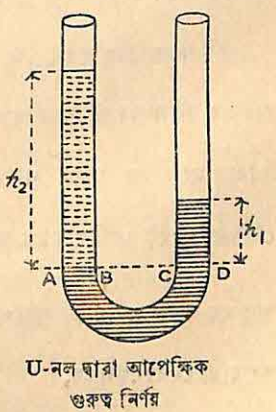
এবং $W_2 - W_1$ = সমায়তন (V ঘ. সে.) জলের ওজন

$$\text{অতএব আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{নির্দিষ্ট আয়তনের কেরোসিনের ভার}}{\text{সমায়তন জলের ভার}}$$

$$= \frac{W_3 - W_1}{W_2 - W_1}$$

(২) **U-নল দ্বারা**

(ক) যে সমস্ত তরল পদার্থ **জল অপেক্ষা ভারী** অথচ জলের সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উবিয়া যায় না (Non-volatile) ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব U-নল পদ্ধতিতে বাহির করা যায়।



U-নল দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়

কাচনির্মিত একটি U-নল লওয়া হইল এবং উহার ভিতর কিছু উল্লিখিত তরল পদার্থ ঢালা হইল। তরল পদার্থের সমোচ্চ-শীলতা ধর্মের জন্য তরল-তল দুইটি বাহুতে একই উচ্চতায় অবস্থান করিবে। এক্ষণে U নলের ভিতর কিছু জল ঢালা হইল। যেহেতু জল এবং তরল পদার্থটির ঘনত্ব এক নহে অতএব নলের এক বাহুর জল-তল এবং অপর বাহুর তরল-তল একই

উচ্চতায় অবস্থান করিবে না এবং তরল পদার্থ অপেক্ষা জল হালকা বলিয়া জলের উচ্চতা সব সময় তরল পদার্থের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হইবে। আবার যেহেতু জল ও তরল পদার্থটি একত্রে মিশ্রিত হয় না সেই হেতু উহাদের একটি সংযোগ-তল (common surface of contact) থাকিবে। মনে করা হইল ঐ সংযোগ-তল AB, AB হইতে এক বাহুর জল কিংবা তরল তলের উচ্চতা এবং ABCD বরাবর CD হইতে আর এক বাহুর জল কিংবা তরল-তলের উচ্চতা স্কেলের সাহায্যে মাপিয়া লওয়া হইল। এক্ষণে সংযোগ-তল হইতে নল মধ্যস্থ জল-তলের উচ্চতাকে সংযোগ তল বরাবর অপর বাহুস্থিত বিন্দু হইতে তরল-তলের উচ্চতা দ্বারা ভাগ করিলে তরল পদার্থটির ঘনত্ব জানা যাইবে।

মনে কর সংযোগ তল বরাবর অপর বাহুস্থিত বিন্দু হইতে নল মধ্যস্থ তরল তলের উচ্চতা $= h_1$ এবং সংযোগ তল হইতে নল মধ্যস্থ জল-তলের উচ্চতা $= h_2$

অতএব নিয়ম মতে তরল পদার্থটির ঘনত্ব $= \dfrac{\text{জলের উচ্চতা}}{\text{তরল পদার্থের উচ্চতা}} = \dfrac{h_2}{h_1}$

এই ঘনত্ব আবার সি. জি. এস. এককে আপেক্ষিক গুরুত্বের সমান, অতএব তরল পদার্থটির ঘনত্ব $=$ তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব $= \dfrac{h_2}{h_1}$।

আবার মনে কর তরল পদার্থটির ঘনত্ব $= d_1$ এবং জলের ঘনত্ব $= d_2$।

তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ যে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব $= \dfrac{\text{পদার্থের ঘনত্ব}}{\text{জলের ঘনত্ব}}$।

অতএব তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব $= \dfrac{d_1}{d_2}$, অতএব উপরের সম্পর্ক অনুযায়ী দেখা গেল যে,

$$\frac{\text{জলের উচ্চতা}}{\text{তরল পদার্থটির উচ্চতা}} = \frac{\text{তরল পদার্থের ঘনত্ব}}{\text{জলের ঘনত্ব}} = \text{তরল পদার্থের}$$

আপেক্ষিক গুরুত্ব, অর্থাৎ $\frac{h_2}{h_1} = \frac{d_1}{d_2}$ = তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব।

কিন্তু সি. জি. এস. এককে জলের ঘনত্ব = জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব = ১

∴ নির্দিষ্ট তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব $d_1 = \frac{h_2}{h_1}$

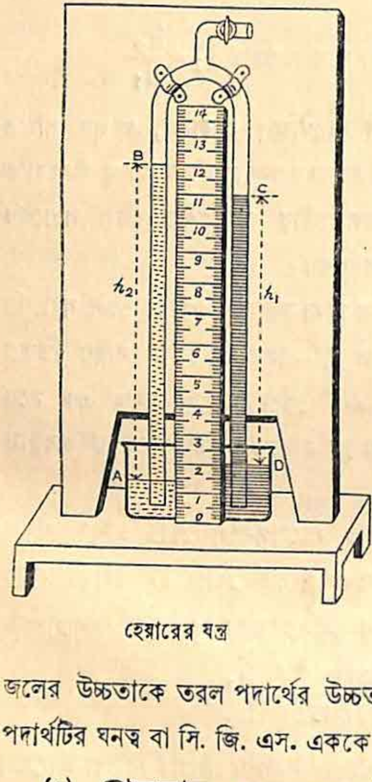
(খ) যে সমস্ত তরল পদার্থ **জল অপেক্ষা হালকা**, জলের সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উবিয়াও যায় না ইহাদেরও আপেক্ষিক গুরুত্ব উপরোক্ত প্রণালীতে বাহির করা যায়। তৈলজাতীয় অমিশ্রণীয় তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব এইভাবে বাহির করা হয়।

U-নলের ভিতর প্রথমে কিছু জল ঢালা হইল। এক্ষণে তরল পদার্থের নমুনা হিসাবে কিছু কেরোসিন তৈল U-নলের যে-কোন বাহুর ভিতর দিয়া ঢালা হইল। যেহেতু জল এবং কেরোসিনের ঘনত্ব এক নহে অতএব উহাদের উপর তল U-নলের দুই বাহুতে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থান করিবে।

মনে কর জল ও তরল পদার্থের সংযোগ-তল AB হইতে তরল পদার্থের উচ্চতা = h_2 এবং সংযোগ-তল হইতে ABCD বরাবর CD হইতে জলের উচ্চতা = h_1 অতএব নির্দিষ্ট তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব (পূর্ব সূত্র মতে) $\frac{\text{জলের উচ্চতা}}{\text{তরল পদার্থের উচ্চতা}} = \frac{h_1}{h_2}$।

(৩) **হেয়ারের যন্ত্র (Hare's apparatus) সাহায্যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়**—জলে মিশ্রিত হয় এইরূপ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিবার জন্য **হেয়ারের যন্ত্র** ব্যবহার করা হয়। দুই ফুট আড়াই ফুট লম্বা একটি পাতলা কাঠের ফ্রেমে একটি লম্বা কাচের U-নল উপুড় করিয়া ক্ল্যাম্প দ্বারা আটকানো আছে। দুই বাহুর মধ্যস্থলে একটি গা-নল (side-tube)

লাগানো আছে (চিত্র দেখ)। U-নলের খোলা মুখ দুইটি যথাক্রমে পাত্রস্থিত জল ও তরল পদার্থের মধ্যে ডুবানো আছে। দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি লম্বা স্কেল লাগানো আছে। গা-নলের সহিত একটি রবারের নল সংযুক্ত করা হয়। এক্ষণে শোষক নলের সাহায্যে বা সাবধানে মুখ দ্বারা নল মধ্যস্থিত বায়ু নিষ্কাশন করিয়া লইলে দুই বাহুতেই যথাক্রমে জল ও তরল পদার্থ উত্থিত হইবে। স্কেলের সাহায্যে পাত্রস্থ জল-তল ও তরল-তল হইতে বাহু মধ্যস্থ জলের ও তরল পদার্থের উচ্চতা মাপিয়া লওয়া হইল। মনে কর জলের দৈর্ঘ্য (AB) = h_2 এবং তরল পদার্থের দৈর্ঘ্য (DC) = h_1 এক্ষণে পূর্ববর্ণিত U-নল প্রথায় জলের উচ্চতাকে তরল পদার্থের উচ্চতা দ্বারা ভাগ করিলেই নির্দিষ্ট তরল পদার্থটির ঘনত্ব বা সি. জি. এস. এককে অপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির হইবে।



হেয়ারের যন্ত্র

(৪) প্লবমান যন্ত্রের (Hydrometer) সাহায্যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়—একদিক মোটা এবং অপর দিক অপেক্ষাকৃত সরু এইরূপ দুইমুখ বন্ধ ওয়ালা একটি কাচ-নল লওয়া হইল। মোটা অংশের শেস প্রান্তে একটি বর্তুলাকার অংশ থাকে। যন্ত্রটিকে জল কিংবা তরল পদার্থের মধ্যে খাড়া ভাবে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বর্তুলাকার অংশটি পারদ অথবা সীসার দ্বারা পূর্ণ

থাকে। যন্ত্রটিকে একটি নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয় এবং নলটির যতটুকু অংশ ডুবিল ঠিক সেই স্থানে দাগ কাটা হয়। এই ভাবে বিভিন্ন প্রকারের নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল পদার্থসমূহের মধ্যে ডুবাইয়া নলটির বিভিন্ন স্থানে (Graduation) দাগ কাটা হয়। কোন তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানিতে হইলে যন্ত্রটিকে সেই পদার্থের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। সরু কাচ-নলের কতখানি অংশ নিমজ্জিত হয় তাহা নলের গায়ে অঙ্কিত (graduated) স্কেল দেখিয়া ঠিক করা হয়। বস্তুতঃ যন্ত্রটির নিমজ্জিত অংশের পরিমাপই সেই তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব।



প্লবমান যন্ত্র

এক্ষেত্রে একটি কথা মনে করিয়া রাখিবে যে, যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব যত বেশী যন্ত্রটির তত বেশী অংশ সেই পদার্থের মধ্যে ভাসিয়া থাকিবে। তরল পদার্থের মধ্যে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া জলে যন্ত্রটির কম অংশ ভাসিয়া থাকিবে। অতএব দুধের কৃত্রিমতা নিরূপণ করিবার কাজেও এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। খাঁটি দুধের একটা নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে, অতএব খাঁটি দুধে যন্ত্রটি যতখানি ভাসিবে, জল মেশানো দুধে তাহার চেয়ে কম অংশ ভাসিবে। দুধ খাঁটি কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য যে ধরনের প্লবমান যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহাকে **ল্যাক্টোমিটার** (Lactometer) বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাপ ও উহার ক্রিয়া

তাপের উৎস

(Sources of Heat)

(১) **সূর্য**—সূর্য হইতে আমরা প্রতিনিয়ত তাপশক্তি পাইয়া থাকি। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জিনিসই সূর্য হইতে তাপ পাইয়া থাকে। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াসা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা সমস্তই সূর্যের তাপের উপর নির্ভরশীল। এক কথায় বলিতে গেলে **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সূর্যই সর্বপ্রকার তাপের উৎস।**

(২) **বিদ্যুৎ শক্তি হইতে তাপশক্তি**—বিদ্যুৎ শক্তি হইতেও তাপশক্তি পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক বাতিতে হাত দিলে গরম বোধ হয়। বৈদ্যুতিক স্টোভ, ইস্ত্রি প্রভৃতির কথা হয়ত তোমরা অনেকেই জান।

(৩) **রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপশক্তি**—কাঠ, কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি জ্বালাইয়া আমরা আলোক ও উত্তাপ পাইয়া থাকি। কাঠ বা কয়লা প্রভৃতি জ্বালাইলে উহার ভিতর যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহার ফলেই আমরা উত্তাপ পাইয়া থাকি। বাজারের কলিচুনে জল ঢালিলেও পাত্রটি কিরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে তাহা তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। ইহাও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপশক্তি পাওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত।

(৪) **যান্ত্রিক শক্তি হইতে তাপশক্তি**—কোন বস্তু সচলত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে শক্তি অর্জন করে তাহাকে বলে যান্ত্রিক শক্তি। হাতে

হাত ঘষিলে, হাতুড়ি দ্বারা লোহা, পাথর বা অনুরূপ কোন কঠিন বস্তুর উপর আঘাত করিলে তাপের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে আদিম যুগের মানুষ, পাথরে পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইত। উপরোক্ত সব ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক শক্তি হইতে তাপশক্তিতে পরিণত হইবার দৃষ্টান্ত।

তাপের ক্রিয়া

(Effects of Heat)

(১) তাপ দিলে জিনিস মাত্রেরই উষ্ণতা বাড়ে, তাপ কমাইলে আবার উষ্ণতা কমিয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাপের বৃদ্ধিতে জিনিসের ধর্মেরও পরিবর্তন হয়, যেমন চুম্বককে তাপ দিলে তাহার চুম্বক-ধর্ম হারায়।

(২) তাপে জিনিসের আয়তন বাড়ে। একমাত্র চর্ম বা চর্মদ্রব্য ছাড়া যে-কোন জিনিসকে উত্তপ্ত করিলে উহার আয়তন বাড়িবে।

(৩) তাপে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বরফ তাপে জল হয়, জল তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। তাপ কমাইলে আবার জিনিসের আয়তন কমিয়া যায় এবং অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। বাষ্প ঠাণ্ডায় জল হয় এবং জলকে বেশী ঠাণ্ডা করিলে বরফে পরিণত হয়।

কঠিন বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

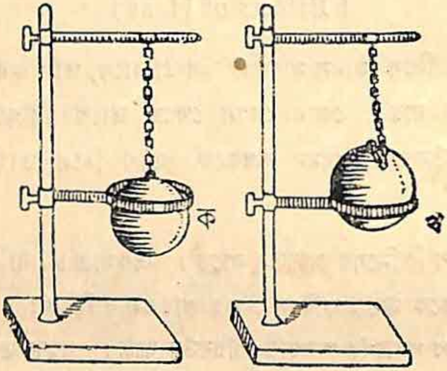
(Effects of Heat on Solid Bodies)

তাপে কঠিন বস্তুর প্রসারণ :—তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় অর্থাৎ আয়তনে বাড়ে। কিন্তু জল ও বায়ুর তুলনায় কঠিন

তাপে অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে। কাঠ বা মোমবাতি প্রভৃতি তাপের প্রভাবে জ্বলে, ফলে কাঠ বা বাতির কার্বন এবং বায়ুর অক্সিজেন মিলিয়া নূতন পদার্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করে এবং অবশেষে প্রায় কিছুই থাকে না।

পদার্থের প্রসারণ অনেক কম বলিয়া চোখে ধরা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা এই প্রসারণ আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

পরীক্ষা :—নীচের চিত্রে লোহার বলটি (ক) স্বাভাবিক অবস্থায় সহজেই আংটির ভিতর দিয়া গলিয়া যায়। কিন্তু যেই বলটি গরম করা হইল, তখনই দেখা যায় গরম বলটি (খ) আর আংটির ভিতর

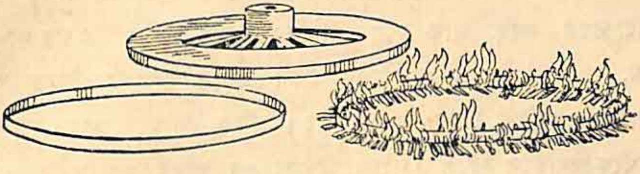


গরম বলটি (খ) আংটির ভিতর দিয়া গলিল না

দিয়া গলিয়া যাইতেছে না। বলটির আয়তন বৃদ্ধির জন্যই যে এইরূপ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। বলটি ঠাণ্ডা হইলে সঙ্কুচিত হইয়া আবার পূর্ববৎ আংটীর ভিতর দিয়া গলিয়া যাইবে।

তাপে প্রসারণের ব্যবহার :—আমরা প্রতিনিয়ত তাপে প্রসারণের পরিচয় পাইয়া থাকি। গরুর গাড়ীর চাকায় যে লোহার বেড় থাকে, উহা চাকার আয়তন অপেক্ষা খুব অল্প ছোট থাকে ; বেড় লাগানোর সময় তাপ দিয়া উহাকে খুব গরম করা হয়। উহাতে বেড়ের আয়তন বাড়ে এবং উহার মধ্যে চাকাটিকে সহজে প্রবেশ করানো যায়। তারপর ঠাণ্ডা হইলে বেড়ের আয়তন কমিয়া যায় এবং উহা বেশ আঁটভাবে চাকা

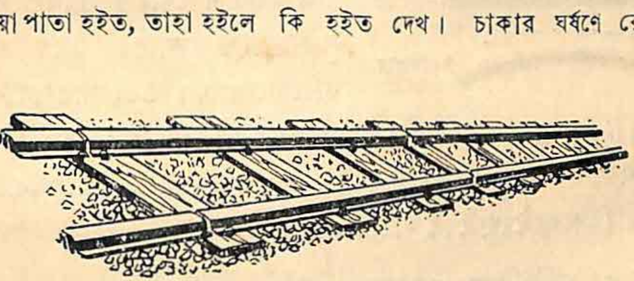
খানির উপর লাগিয়া থাকে। কাচের বোতলের ছিপি আঁটিয়া গেলে



চাকায় বেড় লাগানো

বোতলের মুখ ঈষৎ গরম করিলেই ছিপি আলগা হইয়া যায় তোমরা জান। ইহার কারণ সহজেই বুঝিবে।

রেল লাইন পাতিবার সময় দুইখানি রেলের মাঝে একটু ফাঁক রাখা হয়। ঐরূপ ফাঁক না রাখিয়া যদি দুইখানি রেল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া পাতা হইত, তাহা হইলে কি হইত দেখ। চাকার ঘর্ষণে রেল



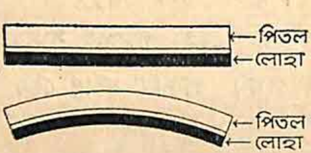
প্রসারণের জন্য দুইখানি রেলের মধ্যে ফাঁক রাখা হইয়াছে

গরম হইয়া দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া যাইত এবং বাঁকিয়া ফুলিয়া উপরে উঠিত এবং ঐ অবস্থায় উহার উপর দিয়া ট্রেন চলিলে ট্রেনের স্থানচ্যুত হইয়া যাইবার খুব আশঙ্কা থাকিত। ফাঁক রাখা হয় বলিয়া তাপে প্রসারিত রেল ঐ ফাঁক দখল করিতে পারে, বাঁকিয়া যায় না।

তাপে কঠিন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন:—কঠিন পদার্থ তাপে কেবল প্রসারিত হয় তাহা নহে, ধাতব পদার্থ আগুনের

তাপে উত্তপ্ত হইয়া লাল হয়, উত্তাপ বাড়াইলে উহা ক্রমে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ও আলো বিকিরণ করিতে থাকে। উত্তাপ বাড়াইলে শেষে উহা গলিয়া তরল অবস্থা লাভ করে। বিভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন উষ্ণতায় গলে। মোম, জমানো ঘি বা নারিকেল তৈল প্রভৃতি পদার্থের উষ্ণতা অল্প মাত্রায় বৃদ্ধি করিলে উহারা গলিয়া যায়। কিন্তু লোহা, তামা ইত্যাদি পদার্থকে গলাইতে হইলে উহাদের উষ্ণতা খুব অধিক মাত্রায় বাড়ানো দরকার হইয়া থাকে।

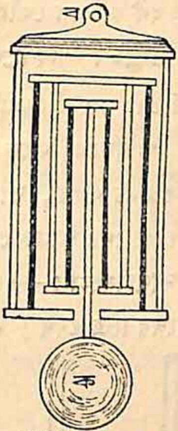
তাপে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর প্রসারণশীলতা— একই তাপে বিভিন্ন কঠিন বস্তু বিভিন্ন পরিমাণে বাড়ে। চিত্রে সমান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট একখানি পিতলের পাত একখানি লোহার পাতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত আছে। তাপে গরম করিলে দেখা যায় উভয় পাতই বাঁকিয়া গিয়াছে ; বাঁকের বাহিরের দিকে পিতল ভিতরের দিকে লোহা থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে তাপে লোহার চেয়ে পিতলের দৈর্ঘ্য বেশী মাত্রায় বাড়ে।



তাপে লোহার চেয়ে পিতল দৈর্ঘ্যে বাড়ে

প্রতিবিহিত দোলক (Compensated Pendulum)— অনেক বড় ঘড়িতে এক প্রকার **প্রতিবিহিত দোলক** ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার উপর তাপের প্রভাব থাকিলেও ঐ দোলকের দৈর্ঘ্য সর্বদাই এক থাকে। চিত্রে একটি প্রতিবিহিত দোলক দেখানো হইয়াছে। ইহাতে লোহা ও পিতল দুই প্রকারের ধাতুর দ্বারা নির্মিত একটি কাঠামো আছে। কাল রেখাগুলি পিতলের দণ্ড এবং সাদা রেখাগুলি লোহার দণ্ড বুঝাইতেছে। চিত্রে চারিটি পিতলের দণ্ড এবং পাঁচটি লোহার দণ্ড আছে। ঠিক মধ্যবর্তী লৌহদণ্ডের সঙ্গে দোলকপিণ্ড বা দুল

ক) যুক্ত আছে। মধ্যবর্তী তুলযুক্ত দণ্ডটিই দোলকদণ্ড। কাঠামোর দুই প্রকারের দণ্ডগুলি এমনভাবে সাজানো যে, উহার পিতলের দণ্ডগুলি তাপে প্রসারিত হইয়া উপরে যতখানি উঠিতে চায়, লোহার দণ্ডগুলি প্রসারিত হইয়া ঠিক ততখানি নীচের দিকে নামিয়া আসিতে চায়। ফলে দাঁড়ায় এই, মাঝখানের দোলকপিণ্ডের ভারকেন্দ্র হইতে দোলকের বিলম্ববিন্দু পর্যন্ত যে ব্যবধান অর্থাৎ দোলকের দৈর্ঘ্য (ক ব) ঠিকই থাকিয়া যায়। কাজেই ইহার ব্যবহারে ঘড়ি সকল ঋতুতেই নির্ভুল সময় জ্ঞাপন করিতে পারে।

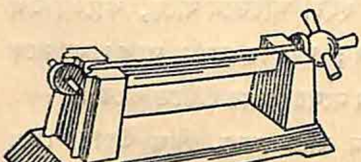


প্রতিবিহিত দোলক

শৈত্যে পদার্থ মাত্রই সঙ্কুচিত হয়:—

উষ্ণতা কমিবার ফলে কঠিন বস্তুর আয়তনও কমিয়া যায়।

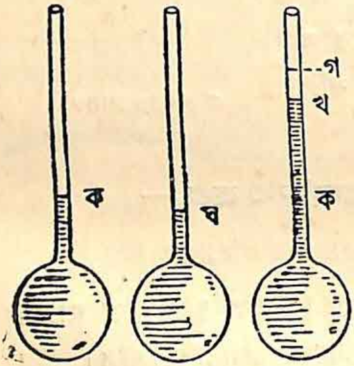
পরীক্ষা:—দুইটি দৃঢ় লৌহস্তম্ভের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র আছে। একটি লম্বা লোহদণ্ড ঐ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। ছিদ্র দুইটির মধ্য দিয়া একটি বেশ মজবুত লৌহ-বল্টু প্রবেশ করিয়াছে। এক প্রান্তে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত লৌহ-কীলক ও অপর প্রান্তে একটি সুদৃঢ় নাট্ দ্বারা সজোরে বল্টু-টিকে আঁটা হয়। লৌহদণ্ডকে উত্তপ্ত করিলে ইহা প্রসারিত হয় এবং এই অবস্থায় নাট্ দ্বারা দৃঢ় ভাবে


লৌহদণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে
কিলক ভাঙ্গিয়া গেল

আঁটিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে দণ্ডটি ঠাণ্ডা হইবার ফলে সঙ্কুচিত হয় এবং লৌহ-বল্টুর চাপে লৌহ-কীলকটি ভাঙ্গিয়া যায়।

তরল পদার্থের উপর তাপের প্রভাব (Effects of heat on liquid) :—তরল পদার্থমাত্রই তাপে প্রসারিত হয় অর্থাৎ উহা আয়তনে বাড়ে। জল এবং তরল পদার্থের অণুগুলি তেমন সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলিয়া, তাপে প্রসারণশক্তি, কঠিন পদার্থের চেয়ে, জল ও তরল পদার্থের অনেক বেশী।

পরীক্ষা :—একটি কাচের ফ্লাস্কের (flask) গোলাকার অংশ (পাশের চিত্র দেখ) এবং উহার সরু নলের 'ক' অবধি জল ভরতি কর



তাপে জলের প্রসারণ

এবং ফ্লাস্কের তলায় তাপ দাও। দেখিবে যতই তাপ দিতেছ, ততই জল নলের মধ্য দিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছে। সুতরাং তাপে জলের আয়তন বাড়ে, আর যত বেশী তাপ দেওয়া যায় আয়তনও তত বেশী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফ্লাস্কের তলায় তাপ দেওয়ার জন্য, ফ্লাস্ক আগে গরম হইয়া আয়তনে বাড়ে, কাজেই জল প্রথমে একটু নীচে (ঘ) নামিয়া আসে ; তারপর যেমনি তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জল গরম হয়, তখনই জলও ক্রমে নলের উপরে উঠিতে থাকে।

তাপের জন্য ফ্লাস্কটিরও আয়তন বাড়ে সত্য, কিন্তু উহার চেয়ে জলের প্রসারণ বেশী বলিয়া, জল নলের ভিতর দিয়া উচুতে (খ) গিয়া দাঁড়ায়। উভয়ের প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা সমান হইলে, তাপ দেওয়ার পরেও জল একই জায়গায় থাকিত, উহাদের প্রত্যেকের আয়তন কিছু বড় হইত মাত্র। তাপে ফ্লাস্কের আয়তন না বাড়িলে, জল আরও

উঁচুতে অর্থাৎ 'খ' জায়গার পরিবর্তে 'গ' জায়গায় উঠিত। তাপ দেওয়া বন্ধ করিলে দেখিবে, জল আস্তে আস্তে নামিয়া পূর্বের আয়তন লাভ করিয়াছে। তাপ বেশী দিতে থাকিলে, জল প্রসারিত হইয়া নলের মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইবে।

তাপে জলের অবস্থার পরিবর্তন (Change of State) :—তাপে প্রথমতঃ জলের আয়তন বাড়ে। তারপর ক্রমাগত তাপ পাইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে। উনুনের উপর বসানো কেতলির জল উত্তপ্ত হইয়া ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং পাশের নল দিয়া বাহির হইয়া যায়, উহা জলের বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কেতলির জলও কমিতে থাকে। কেতলির নলের মুখের একটু দূরে যে সাদা ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায়, উহা জলের বাষ্প নহে। বাষ্প বায়ুর মতই অদৃশ্য। ফুটানো জল হইতে বাষ্প বাহিরে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে। ফলে ঐ বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তৈয়ারি করে। উহারাই সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়। নলের মুখের কাছে শীতল পাত্র রাখিলে উহার উপর ঐ জলকণা জমিতে থাকে, নতুবা আবার বাতাসের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।



জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইতেছে

বাষ্পীভবন (Evaporation) :—কেবল ফুটন্ত জল হইতে বাষ্পের সৃষ্টি হয় না। খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে সর্বদা সকল অবস্থায় জল কম-বেশী বাষ্পীভূত হইতেছে। এইজন্য গ্রীষ্মকালে ঐ সমস্ত জলাশয়ের জল অনেক কমিয়া যায়।

ঘরের মেঝে জল দিয়া ধুইলে, খানিকক্ষণ বাদে মেঝে শুকাইয়া যায়। ভিজা কাপড় টাঙাইয়া রাখিলে, উহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। কাপড় বা মেঝে শুকানোর অর্থ হইল উহাদের সমস্ত জলের বাষ্পে পরিণত হইয়া যাওয়া। ইহা হইতে দেখা গেল, সর্বদা সকল অবস্থাতেই জল হইতে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

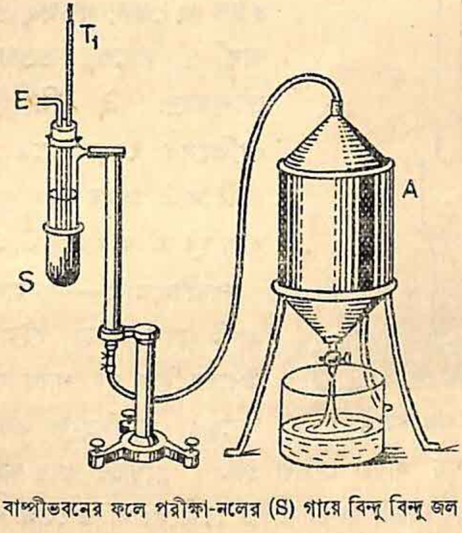
বিভিন্ন জলাশয় হইতে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিয়া থাকে। বায়ুর নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প উহাতে মিশিয়া থাকিতে পারে, বেশী পারে না। কাজেই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত কম হইবে, বিভিন্ন জলাধারে বা জলসিক্ত দ্রব্যসামগ্রী হইতে দ্রুত পরিমাণে জলীয় বাষ্পের উদ্ভব হইবে। বর্ষাকালে বায়ুতে খুব বেশী মাত্রায় জলীয় বাষ্প বর্তমান থাকে এবং ঐজন্য ঐ সময় বিভিন্ন জলাধার বা জলসিক্ত বস্তু হইতে খুব আস্তে আস্তে বাষ্পীভবন চলে, তাড়াতাড়ি হয় না। এই কারণে বর্ষাকালে ভিজা জামাকাপড় শুকাইতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। শীতকালে বা গরমের দিনে জলসিক্ত জিনিস হইতে দ্রুত বাষ্পীভবন ঘটে, ফলে উহা তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়।

বাষ্পীভবনের ফল (Effects of evaporation) :— সাধারণ বাষ্পীভবনের ফল আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। মাটির কলসীতে জল রাখিলে ঠাণ্ডা হয় কেন? মাটির কলসীর গায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল সর্বদাই বাহির হইয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পীভূত হয়। এই যে অবিরাম বাষ্পীভবন চলিতে থাকে, এজন্য কলসীর জলই তাপ প্রদান করে। এইরূপে তাপ হারাইয়া জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। একই কারণে শরীরের ঘাম শুকাইতে থাকিলে শরীর ঠাণ্ডা লাগে। গরম দুধ বা কোন তরল বস্তু ঠাণ্ডা করার জন্য চওড়া পাত্রে ছড়াইয়া রাখা হয় কেন, এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

শরীরের কোন অংশে মেথিলেটেড স্পিরিট লাগিলে সেই অংশে অত্যন্ত

ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে, **মেথিলেটেড স্পিরিট, ইথার** প্রভৃতি কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের বাষ্পীভবন অত্যন্ত দ্রুতবেগে হয় এবং এই দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে উষ্ণতার মাত্রা অত্যন্ত কব হয়।

পরীক্ষা ঃ—গা-নলযুক্ত একটি পরীক্ষা-নল লওয়া হইল। পরীক্ষা-নলটির মুখ একটি ছিপিদ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ছিপিটিকে ছিদ্র করিয়া একটি বাঁকানো কাচ-নল (E) প্রবেশ করানো হইল। ছিপিটির মধ্য-স্থলে আর একটি ছিদ্র করিয়া একটি থার্মমিটার (T_1) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। পরীক্ষা-নলের ভিতর খানিকটা ইথার লওয়া হইল। এক্ষণে

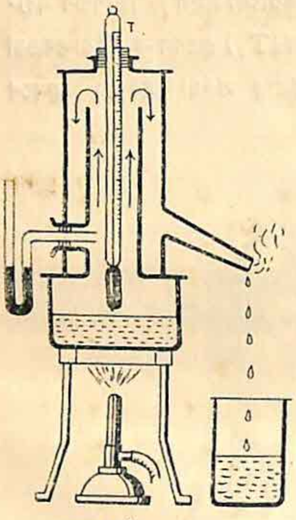


দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে পরীক্ষা-নলের (S) গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে

পরীক্ষা-নলের গা-নলটি একটি বায়ু-চোষণ যন্ত্রের (Aspirator) (A) সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এইবার বায়ু-চোষণ যন্ত্রটির নিম্নস্থ স্টপ-কক্ খুলিয়া দিলে বাঁকানো কাচ-নলের (E) ভিতর দিয়া পরীক্ষা-নলের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে থাকিবে এবং ইথারের ভিতর দিয়া বুদবুদ আকারে বাহির হইয়া যাইবে, ফলে ইথার দ্রুত গতিতে বাষ্পীভূত হইতে থাকিবে। দ্রুত

গতিতে বাষ্পীভবন হওয়ায় পরীক্ষা-নলটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে ফলে, বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পরীক্ষা-নলের বাহির গাত্রে (S) বিন্দু বিন্দু জমিতে থাকিবে।

স্ফুটন (Boiling)—একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যখন জল ফুটিতে থাকে তখন তাহাকে স্ফুটন বলে। জল যখন ফুটিতে থাকে তখন উহার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা হইল ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড*। **জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহাকে যতই তাপ দেওয়া হউক না কেন, যতক্ষণ একটুও জল অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ ইহার তাপমাত্রা ঐ নির্দিষ্ট অঙ্কেই থাকিবে**। কোন পাত্রে করিয়া জল ফুটাইলে ঐ জলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প খুব অধিক মাত্রায় উত্থিত হয়।



জলের স্ফুটনাঙ্ক নিরূপণ

পরীক্ষা :—কাচ বা ধাতু-নির্মিত একটি ফ্লাস্ক লওয়া হইল। ফ্লাস্কটির উপরের দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি গা-নল আছে। এক-ছিদ্রযুক্ত একটি ছিপিদ্বারা ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ফ্লাস্কটির প্রায় অর্ধাংশ জলপূর্ণ করা হইল, এবং একটি গা-নল একটি U-নলের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইল। U-নলটির ভিতর কিছুটা পারদ ঢালিয়া দেওয়া হইল। ফ্লাস্কের ছিপির ছিদ্র দিয়া একটি সেন্টিগ্রেড থার্মমিটার (T) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। (চিত্র দেখ)

*সেন্টিগ্রেড থার্মমিটারে জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রী, ফারেনহাইট থার্মমিটারে ২১২ ডিগ্রী এবং রেমার থার্মমিটারে ৮০ ডিগ্রী।

এক্ষণে ফ্লাস্কটির নীচের দিকে বুন্‌সেন বার্ণার বা স্পিরিট ল্যাম্প দ্বারা উত্তাপ দিতে থাকিলে কিছুক্ষন পরে জল ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকিবে। লক্ষ্য করিতে থাকিলে দেখা যাইবে যে, থার্মমিটারের পারদ ধীরে ধীরে উঠিয়া একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসিয়া স্থির হইয়া যাইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পাত্রে জল ফুটিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত পারদ ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুতেই অবস্থান করিবে। ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুই জলের স্ফুটনাঙ্ক এবং উহা সর্বদাই ১০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। জল ফুটিতে থাকাকালীন ফ্লাস্কের গা-নলের সহিত সংযুক্ত U-নলের উভয় বাহুর পারদ একই উচ্চতায় অবস্থান করিবে, অর্থাৎ U-নলের বাহিরের দিকের বাহুতে পারদের উপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ তাহা ভিতরের দিকের বাহুতে পারদের উপর বাষ্পের চাপের সমান। সুতরাং জল ফুটিবার সময় বাষ্পের যে চাপ তাহা বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান।

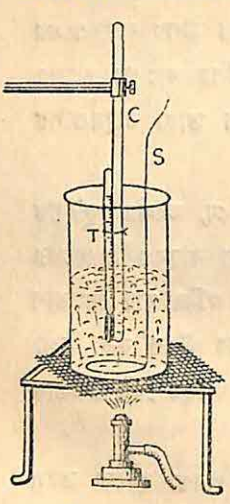
এক্ষেত্রে একটি কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, জলের স্ফুটনাঙ্ক সব স্থানেই ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয় না। ইহা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভর করে। চাপ কমিয়া গেলে স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায় এবং চাপ বাড়িলে স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়া যায়। দার্জিলিং পাহাড়ের উপর যত ডিগ্রী উষ্ণতায় জল ফুটে পুরীর সমুদ্রতীরে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উষ্ণতায় জল ফুটিবে।

দ্রবণ—কোন কঠিন পদার্থ তাহার কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় আসার নাম **দ্রবণ**।

কঠিন পদার্থকে নিয়ত তাপ দিবার ফলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আসিয়া উহা দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে, আবার ঐ দ্রবীভূত পদার্থকে শীতল করিতে থাকিলে ঠিক যে উষ্ণতায় উহা দ্রবীভূত হইয়াছিল, ঐ উষ্ণতায় আসিয়াই পুনরায় কঠিন হইতে আরম্ভ করে। **যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পদার্থ তাহার কঠিন অবস্থা হইতে দ্রব অবস্থায়**

বা দ্রব অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয় তাহাকে ঐ পদার্থের দ্রবণাঙ্ক (Melting-point) বলে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্রবণাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন।

ন্যাপথলিনের দ্রবণাঙ্ক নিরূপণ:—অল্প মাত্রায় ন্যাপথলিন লইয়া একটি পাত্রে দ্রব করা হইল। একটি কৈশিক কাচ-নলে (Capillary glass-tube) ঐ দ্রব পদার্থ কিছু মাত্রায় শোষণ করিয়া লওয়া হইল। নল মধ্যস্থ ঐ পদার্থ ঘনীভূত হইলে ঐ নলের এক প্রান্ত উত্তাপ সাহায্যে গালাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে কাচ-নলের বদ্ধ প্রান্ত থার্মমিটারের পারদপূর্ণ অংশের সহিত রবার-বন্ধনী দ্বারা বেশ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। থার্মমিটারসহ ন্যাপ-থলিনপূর্ণ কাচ-নলটিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে এমন ভাবে রাখা হইল যাহাতে কাচ-নল মধ্যস্থ পদার্থের উচ্চতা পর্যন্ত জলের ভিতর ডুবানো থাকে। জলকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হইতে থাকিল এবং উত্তম রূপে নাড়িতে থাকা হইল। এইরূপ তাপ দিবার ফলে নলের ভিতরের ন্যাপথলিন কিছু সময় পরে গলিয়া স্বচ্ছ হইতে আরম্ভ করিবে। ঠিক যে মুহূর্তে ন্যাপথলিন গলিতে আরম্ভ করিবে সেই মুহূর্তেই থার্মমিটারের সাহায্যে উষ্ণতা দেখিয়া রাখা হইল এবং উহাই প্রকৃত পক্ষে ন্যাপথলিনের দ্রবণাঙ্ক। এক্ষণে তাপ দেওয়া বন্ধ করা হইল, ফলে নল মধ্যস্থ ন্যাপথলিন ধীরে ধীরে শীতল হইতে থাকিল এবং একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা অতিক্রম করিয়াই ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল। দ্রবীভূত স্বচ্ছ ন্যাপথলিন যে উষ্ণতায় আসিয়াই অস্বচ্ছ কঠিন অবস্থায় পরিণত



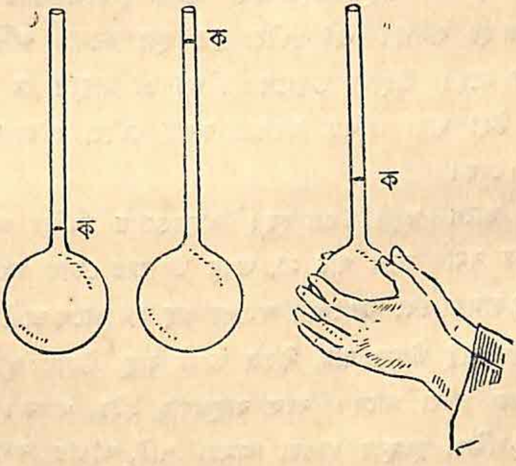
ন্যাপথলিনের দ্রবণাঙ্ক নির্ণয়

হইতে আরম্ভ করিল ঠিক সেই মুহূর্তে পুনরায় থার্মমিটারের সাহায্যে পূর্বের ন্যায় উষ্ণতা দেখিয়া রাখা হইল। দেখা যাইবে যে উভয় ক্ষেত্রেই উষ্ণতার পরিমাপ সমান। সামান্য বিভিন্নতা ঘটিলে দুই পরিমাপের গড় (mean) করিয়া লইলেই ন্যাপথলিনের সঠিক দ্রবণাঙ্ক পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে ন্যাপথলিনের দ্রবণাঙ্ক = ৮০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

বায়বীয় পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

তাপে বায়ুর প্রসারণ:—খুব সরু নলবিশিষ্ট একটি কাচের ফ্লাস্ক (নিম্নের চিত্র দেখ) লও এবং উহার সরু মুখে এক ফোঁটা লাল কালি প্রবেশ করাইয়া, উহাকে আস্তে আস্তে এমনভাবে নাড়



তাপে বায়ুর প্রসারণ

যেন ঐ কালির ফোঁটাটি ফ্লাস্কের গোলাকার অংশের ঠিক উপরে একটি লাল রেখার (ক) মত দাঁড়ায়। এখন ফ্লাস্কের তলায় তাপ দাও। দেখিবে কালির রেখা দ্রুতবেগে উপরে উঠিতেছে। শুধু হাত দিয়া

গোলাকার অংশটি চাপিয়া ধরিলে যতটুকু তাপ হয়, উহার জন্যও কালির রেখা বেশ উপরে উঠিবে। তাপের জন্য ফ্লাস্কের ভিতরকার বায়ুর আয়তন বাড়ে এবং এই প্রসারিত বায়ু কালির রেখাকে উপরে তুলিয়া দেয়। তাপ দেওয়া বন্ধ করিলে, ঠাণ্ডা পাইয়া বায়ুর আয়তন কমে, কালির রেখাও বাহিরের বায়ুর চাপে নীচে নামিয়া আসে।

তাপে বায়ুর প্রসারণের ফল :—তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উহা হালকা হইয়া পড়ে। উনুনে আগুন ধরাইলে উহার নিকটবর্তী বায়ু তপ্ত হইয়া হালকা হয়। এই হালকা বায়ু উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং চারিপাশের ঠাণ্ডা ভারী বায়ু আসিয়া ঐ উত্তপ্ত বায়ুর স্থান অধিকার করে, ফলে উনুনের কাছে একটি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বায়ুপ্রবাহের কথা আমরা বুঝিতে পারি উনুনের উপর ধোঁয়া হয় বলিয়া। এই ধোঁয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কণিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। উনুনের উত্তাপের নিকটবর্তী বায়ুতে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, উহা দ্বারা চালিত কয়লার কণাই ধোঁয়া হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়।

সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ যখন ভূপৃষ্ঠ হইতে সমান তাপ পায় না, তখন উহাদের কোন অংশের বায়ু বেশী তাপে হালকা এবং অন্য কোন অংশের বায়ু কম তাপে ভারী থাকে। হালকা উত্তপ্ত বায়ু উপরে যায়, শীতল ভারী বায়ু উহার স্থান দখল করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। ফলে বায়ুপ্রবাহ হইয়া থাকে। এই যে কোন সময় দক্ষিণা ফুরফুরে হাওয়া আমরা পাই, আবার কখন কখন প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস, সাইক্লোন, ঘূর্ণিবায়ুতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, বায়ু এজন্য দায়ী নহে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে তাপের তারতম্যই ইহাদের মূল কারণ।

উত্তাপ সঞ্চালন

(Transference of Heat)

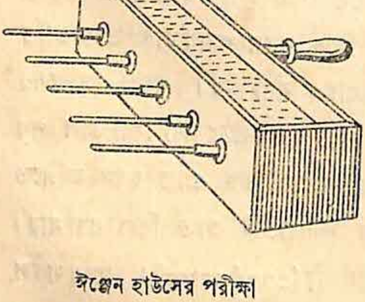
সাধারণতঃ তিন প্রকারে তাপের চলাচল হইয়া থাকে। (১) **পরিবহণ** (Conduction), (২) **পরিচালন** (Convection) এবং (৩) **বিকরণ** (Radiation)।

(১) **পরিবহণ**—একটি লোহার দণ্ডের একপ্রান্তে তাপ দিলে, ঐ প্রান্তের লৌহকণাগুলি প্রথমে গরম হয়। ঐ উত্তপ্ত কণাগুলি নিকটবর্তী অন্য কতকগুলি লৌহকণাকে তাপ দিয়া গরম করে। ইহারা আবার পরবর্তী কতকগুলি কণাকে তাপ দিয়া উহাদিগকেও গরম করে। এই ভাবে দণ্ডের **এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাপ ক্রমে চলিতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত দণ্ডটি উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। তাপের এইরূপ সঞ্চালনের নাম পরিবহণ**। পরিবহণ প্রণালীতে যখন কোন জিনিস গরম করা হয়, তখন উহার এক অংশের কণাগুলি উত্তপ্ত হইয়া ঐ তাপ বহন করিয়া অন্য অংশে সরিয়া যায় না। উহার নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া গরম হয় এবং নিকটবর্তী কণাগুলিকে তাপ অর্পণ করিয়া উহাদের গরম করিয়া থাকে।

পরিবহণ প্রণালীতে কঠিন পদার্থ গরম হইয়া থাকে। যে সমস্ত কঠিন পদার্থের অংশ-বিশেষে তাপ দিলে সমগ্র পদার্থটাই তাড়াতাড়ি গরম হয় তাহাকে তাপের সুপরিবাহক বলা হয়। সকল জিনিসের তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা সমান নয়। কাচ ও কাঠের মধ্য দিয়া তাপ খুব কম যাইতে পারে। উনুনের ভিতরে কাঠের এক প্রান্ত যখন জ্বলিতে থাকে, তখন উহার বাহিরের অংশ অনায়াসেই হাত দিয়া ধরা যায়। ধাতব পদার্থমাত্রই উত্তম **তাপ-পরিবাহী** (conductor)। তবে সকল ধাতুর তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা সমান নহে। অ্যালুমিনিয়াম লোহার চেয়ে

শীঘ্র গরম হয়। ফ্লানেল, করাতের গুঁড়া, তূলা, রেশম, পশম, কাগজ, পাখীর পালক প্রভৃতি খুব কম তাপ-পরিবাহী। এই কারণে, পশম এবং ফ্লানেলের জামা-কাপড় অথবা তূলার লেপ শীতকালে ব্যবহার করিলে, শরীরের তাপ উহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না, শরীর গরম থাকে। পাখীর পালক, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির লোম উহাদের দেহের তাপ আটকাইয়া রাখে, কাজেই বাহিরের ঠাণ্ডায় উহাদের কষ্ট হয় না। করাতের গুঁড়া দিয়া বরফ ঢাকা হয় কেন এখন বুঝিলে। কেতলির যে অংশ ধরিয়া উনুন হইতে নামানো হয় ঐ অংশে বেত জড়ানো থাকে। কেতলিতে জল ফুটানোর পরে বেত-জড়ানো অংশ ধরিয়া আমরা অনায়াসে নামাইয়া থাকি। বেত তাপের ভাল পরিবাহক নয় বলিয়া কেতলির প্রচণ্ড তাপ উহার মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইয়া আমাদের হাতে আসে না। এইজন্য উহা সম্ভবপর হইয়া থাকে জল এবং বায়ু তাপ-পরিবহণে মোটেই ভাল নহে।

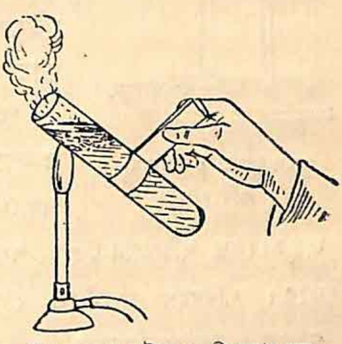
ঈঙ্গেন হাউসের পরীক্ষা (Ingen-Hausz's experiment)—তামা, পিতল, লৌহ প্রভৃতি বিভিন্ন কয়েকপ্রকারের ধাতুদণ্ড (rod) এবং কাঠ, কাচ প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের এক একটি দণ্ড একটি ধাতু-নির্মিত পাত্রের ছিদ্রপথে প্রবেশ করানো হইল। (চিত্রে দেখ)। দণ্ডগুলি প্রত্যেক-টিই সমান দৈর্ঘ্য এবং সমান ব্যাস বিশিষ্ট হইবে। দণ্ডগুলির সামান্য একটু অংশ সমানভাবে ধাতু-পাত্রে প্রবেশ করানো আছে এবং যে অংশ বাহিরে আছে উহাতে মোম দিয়া আস্তরণ করা হইল। এক্ষণে ধাতুপাত্র ফুটন্ত জল দ্বারা



ঈঙ্গেন হাউসের পরীক্ষা

পূর্ণ করা হইলে দণ্ডগুলির মধ্য দিয়া উত্তাপ সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ করিবে এবং মোমও গলিতে আরম্ভ করিবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে, দণ্ডগুলির মোম ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্য পর্যন্ত গলিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের-তাপ পরিবহণ ক্ষমতাও বিভিন্ন।

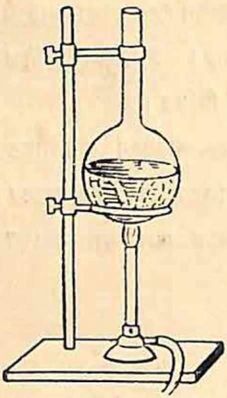
(২) **পরিচলন** (Convection) :—পরিবহণ প্রণালীতে তরল পদার্থ গরম করা যায় না। একটি পরীক্ষা-নলে জল লইয়া জলের উপরকার অংশে তাপ দিতে থাকিলে ঐ উপরকার জল অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গরম হয়। কিন্তু নীচেকার জল প্রায় পূর্বাবস্থাতেই থাকে। (পাশের চিত্র দেখ) একই কারণে সূর্যের তাপে পুষ্করিণীর উপরকার জল বেশ গরম হইলেও নীচেকার জল ঠাণ্ডা থাকে ; বায়ব পদার্থের বেলায়ও এই রকম হইয়া থাকে। কিভাবে তরল পদার্থ গরম হয় দেখা যাউক।



উপরের জল ফুটিতেছে, নীচেকার জল পূর্ববৎ আছে

তাপপরিচলনের পরীক্ষা :—একটা কাচপাত্রে খানিকটা জল লও এবং উহার ভিতরে কিছু মেজেণ্টার গুঁড়া ফেলিয়া পাত্রটি গরম কর। জল গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিবে, রঙের কণাগুলি জলের মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ পরিবহণ প্রণালীতে কাচপাত্রের তলদেশ গরম হয় এবং উহার সংস্পর্শে থাকায় কাচপাত্রের সর্বনিম্ন স্তরের জলও উষ্ণ হয়। এই জল গরম হইয়া আয়তনে বাড়ে এবং হালকা হয়। এই হালকা জল উপরে উঠে এবং ঐ হালকা জলের সঙ্গে রঙের কণা-সকলও উপরে উঠে। এদিকে উপরকার ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে আসিয়া ঐ গরম জলের স্থান

অধিকার করে। এই জল আবার পাত্রের তলদেশে আসিয়া পূর্ববৎ গরম হইয়া হালকা হয় এবং উপরে উঠে, আর উপরের খানিকটা জল নীচে নামিয়া আসে। এইভাবে উপর নীচে একটা জলস্রোত চলে এবং উহার সঙ্গে রঙের কণাগুলিও উঠে নামে। অবশেষে পাত্রের জল সর্বত্র সমান গরম হইয়া পড়ে। **এইরূপে এক স্থান হইতে তাপের অন্য স্থানে চলাচলকে তাপের পরিচলন বলে।**



তাপে জলস্রোত উঠানামা করিতেছে

তাপের পরিবহণ ও পরিচলনের পার্থক্য :—তাপ-পরিবহণে পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলি নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া যায় না কিন্তু পরিচলনে উহারা পদার্থের এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমন করে। পরিবহণ প্রণালীতে কোন পদার্থের যে-কোন অংশ গরম করিলে, অন্যান্য অংশও একটু পরে গরম হয়। কিন্তু পরিচলন প্রণালীতে যে সকল জিনিস (তরল ও বায়বীয়) গরম করা হয়, উহাদের তলাতেই তাপ দিতে হয়। বায়ুমণ্ডল পরিচলন প্রণালীতে গরম হইয়া থাকে।

তাপের পরিচলনের ফল :—একই স্থানের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের উষ্ণতা সমান না হইলে বায়ুতে তাপের পরিচলন ঘটে। ফলে বায়ু গতিশীল হইয়া বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে। স্থল-বায়ু, সমুদ্র-বায়ু ও বাণিজ্য-বায়ু তাপের পরিচলনের জন্যই প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে।

জল ও তাপের পরিচলন :—জলে তাপ-পরিবহণ হয় না। পরিচলন প্রণালীতে জল গরম হইয়া থাকে। গরমের দিনে নদী, পুকুর প্রভৃতির উপরের জল গরম হয়। কিন্তু ঐ গরম জল

আয়তনে বাড়ে এবং ফলে হালকা হয় বলিয়া উপরেই থাকে ; নীচে গিয়া নীচেকার ঠাণ্ডা জলকে গরম করিতে পারে না। কাজেই মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবদের থাকিতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু খুব ঠাণ্ডা জায়গায় নদী বা পুকুরের উপরের জল ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত ও ভারী হয় এবং তলায় চলিয়া যায় এবং নীচেকার জল উপরে আসে। উহা আবার ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া তলায় যায়। এইভাবে সমস্তটা জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কিন্তু নীচেকার জল জমিয়া বরফে পরিণত হইতে পারে না।

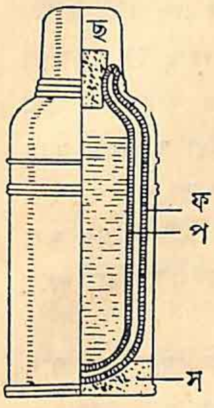
জলের ঘনত্ব ও উহার উপর তাপের প্রভাব:—তাপে সমস্ত জিনিসের আয়তন বাড়ে এবং ঘনত্ব কমিয়া যায়। আবার ঠাণ্ডায় সমস্ত জিনিসের আয়তন কমে এবং ফলে ঘনত্ব বাড়ে। জলের বেলায় একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। স্বাভাবিক উষ্ণতা হইতে জলের উষ্ণতা বাড়াইতে থাকিলে উহার ঘনত্ব ক্রমে কমিতে থাকে। কিন্তু উহাকে ক্রমে ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে উহার ঘনত্ব ক্রমে বাড়িয়া চলে—শেষটায় ৪ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে উহার সর্বোচ্চ ঘনত্ব পাওয়া যায়। ৪ ডিগ্রীরও নীচে উষ্ণতা কমাইতে থাকিলে জলের ঘনত্ব আবার ক্রমে কমিয়া চলে এবং শূন্য ডিগ্রীতে পৌছাইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ জলের চেয়ে হালকা। কাজেই উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে, কখনও নীচে জমিবার সুযোগ পায় না। এইজন্য খুব শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলের নিকটস্থ নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ের জলের উপরিভাগেই বরফ জমিতে দেখা যায়, খুব নীচের গভীর অংশে কোন বরফ জমে না। কাজেই মৎস্যাদি জলচর জীবের প্রাণধারণের কোন অন্তরায় ঘটে না।

(৩) **বিকিরণ** (Radiation of Heat):—একটি উনুনে আগুন ধরাইয়া উহার কিছু দূরে একপাশে বসিলে আমরা গরম অনুভব

করি। এখানে কোন কঠিন পদার্থ, যেমন লোহা দ্বারা আমাদের সঙ্গে উনুনের আগুনের কোন যোগ নাই। উনুন এবং আমাদের মাঝখানে আছে বায়ু। এই বায়ুর যে অংশ উনুনের ঠিক কাছে উহা গরম হইয়া হালকা হয়। এই হালকা বায়ু আশেপাশে বা নীচে না যাইয়া উপরেই উঠিবে। অতএব পরিবহণ ও পরিচলন প্রণালীতে তাপ আমাদের নিকট আসে না। অথচ উনুনের একপাশে থাকিয়া আমরা তাপ অনুভব করি। **কোন পদার্থের সাহায্য ভিন্ন এই যে প্রণালীতে তাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, ইহাকে তাপের বিকিরণ বলে।** বৈজ্ঞানিকগণ আলো ও তাপের বিকিরণ বুঝাইতে গিয়া ঈথারের পরিকল্পনা করিয়াছেন। জল, স্থল, বায়ু অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া এই ঈথার বিদ্যমান আছে। সূর্যের বা কোন আগুনের উৎস উহাদের চারিপার্শ্বের ঈথারে এক প্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং এই তরঙ্গ তাপশক্তিকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়। উনুনের আগুনের চারিদিকে ঈথার-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গ আসিয়া আমাদের শরীর স্পর্শ করে বলিয়া আমরা গরম অনুভব করিয়া থাকি। তাপশক্তি যখন ঈথারের সাহায্য লইয়া বিকীর্ণ হয়, তখন বায়ুর উষ্ণতার কোন পরিবর্তন ঘটে না। সূর্য তাপ বিকিরণ করে ; এজন্য সূর্যতাপ ভূপৃষ্ঠে পৌছিবার পূর্বে মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় না।

তাপ বিকিরণের দৃষ্টান্ত :—তাপ বিকিরণের ছোট-খাটো দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত। গরম জিনিস আস্তে আস্তে তাপ বিকিরণ করিয়া ঠাণ্ডা হয়। দিনের বেলা ভূপৃষ্ঠ সূর্যের বিকীর্ণ তাপে উত্তপ্ত হয়। রাত্রে ভূপৃষ্ঠ ঐ তাপ উর্ধ্বে বিকিরণ করিয়া আবার ঠাণ্ডা হয়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় টিনের ঘরে থাকা যায় না, কিন্তু রাত্রিকালে টিন হইতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ঘর পুনরায় বেশ ঠাণ্ডা হয়।

থার্মো-ফ্লাস্ক (Thermo-flask)—চিত্রে একটি থার্মো-ফ্লাস্ক দেখানো হইয়াছে। ইহার প্রধান অংশটি একটি কাচের পাত্র। কাচ-পাত্রটির দুইটি স্তর (প ও ফ) আছে। ঐ স্তর দুইটির মধ্যবর্তি স্থান বায়ুশূন্য করা হয়। 'প' ও 'ফ' স্তর দুইটি সাদা ও মসৃণ, আয়নার মত। কাচপাত্রটি একটি রঙীন ধাতব পাত্রের মধ্যে সোলার (স) উপর বসানো, উপরের খোলা মুখ সোলার ছিপি (ছ) দ্বারা বন্ধ করা হয়, তারপর আবার ধাতুর ঢাকনি দ্বারা ধাতব পাত্রটির মুখ আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই সম্মিলিত যন্ত্রটিই থার্মো-ফ্লাস্ক। ইহাতে গরম দুধ বা জল রাখিলে কি হয় দেখ। পাত্রটি কাচের এবং উহার উপরে



থার্মো-ফ্লাস্ক

নীচে সোলা—ইহারা কু-পরিবাহক বলিয়া পরিবহণ প্রথায় তাপ বাহির হইতে পারে না। কাচপাত্রের দুইটি স্তর অর্থাৎ 'প' ও 'ফ'-এর মধ্যবর্তি স্থান বায়ুশূন্য, কাজেই বায়ুর অভাবে তাপ-পরিচলনও সম্ভব নয়। আবার সাদা ও মসৃণ বলিয়া কাচপাত্রটি খুব কম তাপই বিকিরণ করে। সুতরাং কোন প্রকারেই ভিতরের তাপ বিশেষ কমিতে পারে না বলিয়া ফ্লাস্কের দুধ, জল বা যে কোন রকম তরল পানীয় অনেকক্ষণ গরম থাকিয়া যায়।

উপরে যে থার্মো-ফ্লাস্কের ছবি দেখিতেছ উহার ডান-দিকের অর্ধাংশে যন্ত্রটির আভ্যন্তরীণ নির্মাণকৌশল দেখানো হইয়াছে। বামদিকের অর্ধাংশ থার্মো-ফ্লাস্কের বাহিরের দৃশ্য।


থার্মোস্কোপ

থার্মোস্কোপ (Thermoscope)—দুই প্রান্তে দুইটি কাচ-গোলক বিশিষ্ট একটি বাঁকানো কাচ-নল লওয়া হইল। নলমধ্যস্থ বায়ু

নিষ্কাশিত করিয়া উহার ভিতর কিছু পরিমাণ রঙীন **ইথার** প্রবেশ করাইয়া খোলা মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে নলটির মধ্যে কেবলমাত্র ইথার ও ইথার বাষ্প থাকিল। একটি কাচ-গোলক বেশ করিয়া কালো রং বা ভুসা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ অবস্থায় U-নলের দুই বাহুতে ইথার একই উচ্চতায় অবস্থান করে। ইহার কোন একটি বাহুর উষ্ণতা বাড়িলে নলের ভিতরের ইথার-বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বাড়ে এবং সেই বাহুর ইথারের উপর চাপ দেয়। এক্ষণে ভুসার তাপ-শোষণ ক্ষমতা অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী অতএব বিকির্ণ তাপ ভুসা শোষণ করিয়া লয়, ফলে নলমধ্যস্থ ইথার বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বাড়ে এবং ইথারকে ঠেলিয়া অপর বাহুতে লইয়া যায়।

উপরে যে থার্মোস্কোপের কথা বলা হইল উহাকে ইথার-থার্মোস্কোপ বলে। ইহা ছাড়া আরও অন্য ধরণের থার্মোস্কোপ আছে। বৈজ্ঞানিক লেসলী এক ধরণের থার্মোস্কোপ ব্যবহার করিতেন; উহাতে ইথারের পরিবর্তে রঙীন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। বিকির্ণ তাপের উষ্ণতা নিরুপণ করিবার ও পরিমাপ করিবার কাজে ইহা ব্যবহার হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধাতুতত্ব

স্মরণাতীত কাল হইতে বহু কার্যে মানুষ ধাতুর ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আদিম মানুষ পাথরের অস্ত্র নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা ও আহার্য সংগ্রহ করিত, ক্রমে ব্রোঞ্জ এবং পরে লোহার ব্যবহার শিখিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব বহু বৎসর আগেও মানুষ ব্রোঞ্জ প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহার ব্যবহার জানিত। অতএব ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে প্রস্তর যুগ, পরে ব্রোঞ্জ যুগ এবং সর্বশেষের যুগকে অর্থাৎ বর্তমান যুগকে লৌহযুগ বলা হইয়াছে।

সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধাতুর বহু প্রকারের ব্যবহার শিখিয়াছে।

ভারতবর্ষের খনিজ-সম্পদ অপ্রচুর নহে। প্রবাদ যে, কোন দেশ কতখানি সমৃদ্ধিশালী তাহার বিচার হয় সেই দেশের প্রধানতঃ লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের উপর। ভারতবর্ষও ঐ দিক দিয়া পিছাইয়া নাই। খনিজ্ঞ-সম্পদের মধ্যে লৌহ ছাড়া অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাঙ্গানীজ, তামা, স্বর্ণ, প্রভৃতিও ভারতে পাওয়া যায়।

সমস্ত ধাতুই প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। কোন কোন ধাতু মৌলিক বা অবিমিশ্র অবস্থায় যেমন সোনা আবার কোন কোন ধাতু অন্যান্য পদার্থের সহিত যৌগিক বা মিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় যেমন লোহা।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে খনি হইতে পাওয়া ঐ সমস্ত ধাতু বিশুদ্ধ নহে এবং ব্যবহারযোগ্যও নহে! ঐ সমস্ত ধাতুকে ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে উহাদিগকে যথাযথভাবে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

খনি হইতে সদ্যপ্রাপ্ত ধাতুকে বলা হয় **আকরিক** (Ore)। আকরিক-সমূহ হইতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

কতগুকলি বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে আকরিক হইতে বিশুদ্ধ ধাতু পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এখানে দু'একটির নমুনা দেওয়া হইল।

(১) **ভর্জন** (Roasting)—এই প্রথায় কোন আকরিককে বায়ুর সংস্পর্শে তাহার গলনাঙ্কের নিম্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া তাহাকে অক্সাইডে পরিণত করা হয়।

(২) **ভস্মীকরণ** (Calcination)—এই প্রথায় ধাতুকে উদ্বায়ী (volatile) পদার্থসমূহ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে গলনাঙ্কের নিম্ন উষ্ণতা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়।

(৩) **বিজারণ** (Reduction)—এই প্রথায় অক্সিজেন মিশ্রিত ধাতুর আকরিক হইতে ধাতুকে পৃথক করা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস, কার্বন বা অন্যান্য ধাতুর সহযোগে মূল ধাতু হইতে অক্সিজেন পৃথক করা হয়।

(৪) **কার্বন বিজারণ** (Carbon reduction)—এই প্রথায় কার্বন সহযোগে যৌগিক ধাতুকে উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে অক্সিজেন মুক্ত করা হয়।

(৫) **বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ** (Electrolysis)—দ্রব বা তরল অবস্থায় কোন কোন যৌগিক পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলে উহা হইতে মূল পদার্থ বাহির হইয়া আসে। এই প্রথাকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলে। এই প্রথায় কোন কোন ধাতু তাহার আকরিক হইতে মূল অবস্থায় পাওয়া যায়।

উল্লিখিত প্রথাসমূহ ছাড়াও ধাতু নিষ্কাশনের কার্যে আরও অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

কয়েকটি ধাতু (metals) ও সংকর ধাতু (alloys) সম্বন্ধে আলোচনা

তামা

(Copper)

তামা বা 'কপার'-এর ব্যবহার বহু পুরাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। তামা পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইতালি, রাশিয়া ও আমেরিকাতে এরূপ তামার খনি আছে। কিন্তু অধিকাংশ তামাই প্রকৃতিভাণ্ডারে বিভিন্ন জিনিসের সহিত মিশিয়া যৌগিক অবস্থায় থাকে। তামাযুক্ত নানাপ্রকার আকরিক (ore) বা খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্রমাক্ষিক বা কপার পাইরাইটিস্, কপার গ্লান্স, কিউপ্রাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ তামাই সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য কপার পাইরাইটিস্ আকরিক হইতে প্রস্তুত করা হয়। আকরিক হইতে তাম্র নিষ্কাশন করিয়া উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয় ও পরে ইচ্ছামত কাজে লাগানো হয়।

তামার ধর্ম—তামার একটি বিশেষ লাল রং আছে উহাকে 'তামাটে লাল' বলা হয়। ইহা তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮'৮৫ এবং ১০৮৩° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় ইহাকে গালানো যায়। জল ১০০° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় ফোটে, কাজেই তামার গলনাঙ্ক যে খুব বেশী তাহা সহজেই বুঝা যায়। শুষ্ক বাতাসে তামার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আর্দ্র বাতাসে দীর্ঘকাল থাকিলে ইহার উপর ঐ ধাতুর অক্সাইডের একটি পাতলা আবরণ পড়ে। বিশেষ কতকগুলি অ্যাসিডের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তামার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতে দেখা যায়।

তামার ব্যবহার—বিদ্যুৎ-শিল্পে তামার ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অধিকাংশ স্থলেই তামার তার

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের ব্যবহার্য বাসনপত্রও অনেক সময় তামা হইতে তৈয়ারি হয়। তামা এবং অন্য কতকগুলি ধাতুর সংমিশ্রণের ফলে নানাপ্রকার অ্যালয়্ বা সংকর ধাতু উৎপন্ন হয়। তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে পাওয়া যায় পিতল, তামা, দস্তা ও টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ তৈয়ারি করা হয়; তামা, দস্তা ও নিকেলের সংমিশ্রণে পাওয়া যায় জার্মান-সিল্‌ভার। কাঁসা বা বেল্ মেটাল তৈয়ারি হয় তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে। মুদ্রা তৈয়ারির উপাদান হিসাবেও তামার প্রয়োজন হয়।

অ্যালুমিনিয়াম
(Aluminium)

প্রকৃতির ভাণ্ডারে অ্যালুমিনিয়াম মৌলিক অবস্থায় থাকে না, কিন্তু উহার নানাপ্রকার যৌগিক প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। হিসাবে জানা যায়, সমস্ত ধাতুর ভিতর অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী। উহার আবার অধিকাংশই সিলিকেট হিসাবে মাটিতে বা মাটি-পাথরে থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের নানা খনিজের মধ্যে বক্সাইট্, ক্রায়োলাইট্, ক্যাওলিন ও ফেল্‌স্পার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বক্সাইট্ হইতে অ্যালুমিনা প্রস্তুত করিয়া এই অ্যালুমিনার তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম পৃথক করা হয়। তারপরে এই অ্যালুমিনিয়ামের তড়িৎ-বিশোধন দ্বারা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়।

অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম—অ্যালুমিনিয়ামের রং সাদা, কিন্তু ইহার স্বল্পনীলাভ একটা দ্যুতি আছে। ইহা খুব হালকা, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৭; ৬৫৮° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম গলে। ইহা বিদ্যুতের সুপরিবাহক। শুষ্ক বাতাসে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আর্দ্র বায়ুতে রাখা হইলে অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটা পাতলা অক্সাইডের আবরণ পড়ে।

অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার—এরোপ্লেন, বাসনপত্র, চেয়ার বাক্স প্রভৃতির নির্মাণকার্যে, বৈদ্যুতিক কেব্‌ল্ (তার) হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। তিসির তেল মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ রং হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ ছাড়া থারমাইট বোমা প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

লৌহ
(Iron)

পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার বিপুল। ভূত্বকের প্রতি শত ভাগের প্রায় ৪'১২ ভাগই লৌহ বা 'আয়রন'। অবিমিশ্র অর্থাৎ মৌলিকভাবে লোহা বিশেষ দেখা যায় না। ধাতুময় উল্কাপিণ্ডের মধ্যে যতটুকু লৌহ পাওয়া যায় শুধু তাহাই মৌলিকভাবে থাকে। প্রকৃতিলব্ধ অন্যান্য সমস্ত লৌহই বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া যৌগিক অবস্থায় থাকে। লৌহযুক্ত নানা আকরিক বা খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাগ্‌নেটাইট, হিমাটাইট ও আয়রন-পাইরাইটিস্ বা লৌহ-মাক্ষিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর লৌহ খনিজ আছে। ভারতের মত অন্য আর কোন দেশে এত প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর হিমাটাইট পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে জামসেদপুরের টাটার লৌহকারখানা, আসানসোলের 'স্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল' পরিচালিত কারখানা এবং ভদ্রাবতীর 'মহীশূর আয়রন ওয়ার্ক্‌স' নামীয় কারখানা হিমাটাইট-সমৃদ্ধ অঞ্চলের কাছে স্থাপিত হইয়াছে।

লৌহ আকরিককে প্রথমে ভর্জিত (Roasting) করিয়া পরে ঝটিকা চুল্লীতে (Blast furnace) কয়লা ও চুনাপাথর মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা পোড়ানো হয়। ইহার ফলে লৌহ, তাহার আকরিক অবস্থায় মিশ্রিত অন্যান্য অশুদ্ধ পদার্থ হইতে মুক্ত হয়। ইহাকেই কাস্ট আয়রন বা পিগ আয়রন বলে। কাস্ট আয়রণে অত্যধিক মাত্রায় কার্বন

মিশ্রিত থাকে। গলিত কাস্ট আয়রনের উপর উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ইহাকে কার্বনমুক্ত করা হয়, পরে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত চুল্লীতে (converter) ঢালিয়া পরিমাণ মত কার্বন (carbon) মিশাইয়া লইলেই স্টীল প্রস্তুত হয়।

লৌহের ধর্ম—বিশুদ্ধ লৌহ উজ্জ্বল সাদা রঙের ধাতু। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৮৫ এবং ইহা ১৫৩০° সেন্টিগ্রেডে গলে। চুম্বক দ্বারা ইহা আকৃষ্ট হয়। সাধারণ লোহা আর্দ্র বাতাসে রাখিলে উহার উপরিভাগ আস্তে আস্তে বাদামী রঙের গুঁড়ায় পরিণত হয়। ইহাকে লৌহের মরিচা ধরা বলে। আমরা সচরাচর যে সব লৌহ বা লৌহের জিনিস দেখি উহারা বিশুদ্ধ লৌহ নহে। সাধারণ লোহার সহিত অল্পাধিক পরিমাণ কার্বন ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। লৌহের ধর্ম ও গুণাগুণ, মিশ্রিত কার্বনের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। কার্বনের অনুপাত অনুযায়ী লৌহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—(১) কাস্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা, (২) রট আয়রন বা পেটা লোহা এবং (৩) স্টীল বা ইস্পাত। খনিজ লৌহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা তিন প্রকার লৌহ তৈয়ারি হয়।

(১) কাস্ট আয়রন ১২০০° সেন্টিগ্রেডে গলে। ইহা বেশ কঠিন তবে অত্যন্ত ভঙ্গুর। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায় না। লোহার রেলিং, গৃহের তৈজসপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

(২) রট আয়রন ১৫০০° সেন্টিগ্রেডে গলে। ইহা অপেক্ষাকৃত নরম। রট আয়রন স্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে না। ইহা হইতে সরু তার বা চাদর তৈয়ারি করা যায়। তার, জাল ও বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার পক্ষে রট আয়রনই প্রশস্ত।

(৩) স্টীল সাধারণতঃ ১৩৫০° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় গলে। শক্ত এবং নরম দুই প্রকার স্টীলই পাওয়া যায়। স্টীলকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়। ঘড়ি, চুম্বক, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া এঞ্জিন, রেলের

চাকা ও লাইন, ছুরি ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুতেই স্টীলের দরকার হইয়া থাকে।

লৌহের ব্যবহার—এখন ধাতুর মধ্যে লৌহের ব্যবহার সর্বাধিক। লৌহের তিনটি শ্রেণী অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকটির ব্যবহার উপরে বলা হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র এখন এত প্রচুর লৌহের ব্যবহার হয় যে বর্তমান যুগকে লৌহযুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দস্তা
(Zinc)

প্রকৃতির ভাণ্ডারে 'জিঙ্ক' বা দস্তা মৌলিক অবস্থায় থাকে না। সমস্ত দস্তাই যৌগিকভাবে খনিতে পাওয়া যায়। দস্তাযুক্ত আকরিক বা খনিজ পদার্থের মধ্যে জিঙ্ক-ব্লেণ্ড্; জিঙ্কাইট, ক্যালামাইন ও উইলেমাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জিঙ্ক-ব্লেণ্ডে কেবল দস্তা ও গন্ধক থাকে; ইহা হইতেই প্রায় সমস্ত দস্তা উৎপাদন করা হয়। জিঙ্ক-ব্লেণ্ডকে প্রথমে ভর্জিত করিয়া জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত করা হয়, পরে উহার সহিত পরিমাণমত কার্বন মিশ্রিত করিয়া তাপের সাহায্যে বিজারণ (Reduction) করিয়া দস্তাকে উহার আকরিক হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

দস্তার ধর্ম—দস্তা ঈষৎ-নীলাভ সাদা বস্তু। বায়ুতে রাখিয়া দিলে ইহার গায়ে একটি জিঙ্ক-অক্সাইডের স্তর বা প্রলেপ পড়ে, ফলে উহার ধাতব দ্যুতি সচরাচর আর দেখা যায় না। দস্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·১৪ এবং ইহা ৪১৯° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় গলে।

দস্তার ব্যবহার—নানাপ্রকার তড়িৎ-সেল ও ব্যাটারিতে দস্তার প্রয়োজন হয়। লোহার নানা জিনিস, ঘরের টিন, জলের বালতি প্রভৃতি গলিত দস্তায় ডুবাইলে ঐ সমস্ত জিনিসের উপর একটা দস্তার প্রলেপ পড়ে। এই প্রক্রিয়াকেই গ্যাল্ভ্যানাইজ্ করা বলে। গ্যাল্ভ্যানাইজ্ করা

লোহাতে মরিচা পড়িতে পারে না। এ ছাড়া অনেক রকম ধাতুসংকর তৈয়ারিতে দস্তা ব্যবহৃত হয়। তামা ও দস্তার সমন্বয়ে পিতল তৈয়ারি হয়। কোন কোন মুদ্রার অন্যতম উপাদান হিসাবে দস্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সীসা
(Lead)

সীসা বা 'লেড্'-মিশ্রিত নানারূপ আকরিক বা খনিজ পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে গ্যালেনাই প্রধান। গ্যালেনায় সীসা ও গন্ধক মিশিয়া থাকে। সমস্ত সীসা ধাতুই গ্যালেনা হইতে প্রস্তুত করা হয়।

গ্যালেনা হইতে বায়ু বিজারণ (Air reduction) অথবা কার্বন বিজারণ (Carbon reduction) প্রণালী দ্বারা সীসাকে পৃথক করা হয়।

সীসার ধর্ম—সীসার রং ধূসর কিন্তু ইহার একটি ধাতব দ্যুতি দেখা যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১১·৪ এবং ইহা ৩২৬° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় গলে। বেশী ভারী হইলেও সীসা অত্যন্ত নরম ধাতু, ছুরি দ্বারা উহাকে কাটিয়া ফেলা কঠিন নয়। কাগজের উপর সীসা কালো দাগ কাটিতে পারে। শুষ্ক বিশুদ্ধ বায়ুতে সীসার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আর্দ্র বাতাসে বস্তুটির উপর একটা সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে।

সীসার ব্যবহার—ছাপাখানার জন্য টাইপ-ধাতু প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট সীসা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শতকরা সীসা ৮২ ভাগ, অ্যাণ্টিমনি ধাতু ১৫ ভাগ এবং টিন ৩ ভাগ থাকে। সীসা ও টিনের সংকর ধাতু ঝালাই করার কাজে দরকার হয়। জল সরবরাহের জন্য নানা রকম নল সীসা

হইতে প্রস্তুত হয়। ব্যাটারি নির্মাণে এবং তড়িৎ-বাহী তারের আবরক হিসাবে সীসার প্রচলন খুব বেশী।

পারদ
(Mercury)

প্রকৃতিতে কখন কখন অত্যল্প পরিমাণে পারদ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। পারদযুক্ত আকরিক বা খনিজ পদার্থের মধ্যে 'সিনাবার'ই প্রধান। ইহাতে পারদ ও গন্ধক মিশিয়া থাকে। হিঙ্গুল নামে ইহা পরিচিত। সমস্ত পারদই সিনাবার হইতে প্রস্তুত করা হয়। ভর্জন ও পাতন (Roasting and distillation) পদ্ধতিতে হিঙ্গুল হইতে পারদ পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

পারদের ধর্ম—সাধারণ অবস্থায় বিশুদ্ধ পারদ রূপার মত সাদা ও উজ্জ্বল তরল পদার্থ। ধাতুর মধ্যে একমাত্র পারদই সাধারণ উত্তাপে তরল অবস্থায় থাকে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩'৬। ইহা −৩৮'৯° সেণ্টিগ্রেডে জমিয়া কঠিন হয় এবং ৩৫৬° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ফোটে। ইহা কাচ বা পাথরের গায়ে লাগিয়া থাকে না, এবং ইহার আয়তন উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়ে। এজন্য থার্মমিটার ও নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুতের কাজে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। অধিকাংশ ধাতুই পারদের সংস্পর্শে আসিলে পারদে দ্রবীভূত হইয়া পারদ সংকরের সৃষ্টি করে। তামা, সীসা, দস্তা, সোনা, রূপা ইত্যাদি সহজেই পারদের সহিত সংকর ধাতুতে পরিণত হয়, কিন্তু লোহা সহজে পারদে দ্রব হয় না।

পারদের ব্যবহার—থার্মমিটার ও নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুতিতে পারদ ব্যবহৃত হয়।

টিন

(Tin)

টিনের ব্যবহার বহু পুরাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। টিন সাইবেরিয়া অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া টিন অক্সাইড রূপে টিন স্টোন বা ক্যাসিটেরাইট নামে মালয়, ব্রহ্মদেশের ট্যাভয় জেলায়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিহার প্রদেশের হাজরীবাগ জেলায় কিছু পরিমাণে টিন স্টোন পাওয়া যায়। টিন স্টোনকে যথাক্রমে ভস্মীকরণ (Calcination), ধৌতকরণ (Washing), বিজারণ (Reduction) ও সর্বশেষে তরলীকরণ (Liquation) এবং পোলিং (Poling) পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

টিনের ধর্ম—টিন সাদা রঙের উজ্জ্বল ধাতু। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৩। ইহা নরম ও সহজেই নমনীয় এবং এই জন্যই ইহাকে অতি সহজেই পাতে পরিণত করা যায়। ২০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্ উত্তাপে ইহা ভঙ্গুর অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ২৩২° সেণ্টিগ্রেড্ উত্তাপে টিন দ্রব হয়। সাদা টিন অত্যন্ত ঠাণ্ডায় (১৮° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতার নীচে) গুঁড়ায় পরিণত হয়, উহাকে ধূসর টিন বলে।

রাশিয়া প্রভৃতির ন্যায় শীতপ্রধান দেশে টিনের দ্রব্যাদি এইরূপ ধূসর ও গুঁড়া হইয়া যায়। ইহাকে টিন প্লেগ (Tin Plague) বলে। টিনের পাতকে বাঁকাইলে একপ্রকার শব্দ নির্গত হয়, উহাকে টিনের ঝঙ্কার (Tin-cry) বলে। টিনের সহিত শুষ্ক বায়ু বা জলের কোন ক্রিয়া নাই।

টিনের ব্যবহার—গৃহস্থালির কাজের বাসনপত্রাদি প্রস্তুতের কাজে, টিনের কলাই, টিনের প্লেট প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজে, ঘর-দুয়ার নির্মাণের কাজে ও নানা প্রকার সংকর ধাতু নির্মাণের কাজে টিনের ব্যবহার হয়।

রূপা

(Silver)

রূপা মুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে মেক্সিকো, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু তামা ও সোনা ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে।

সিল্‌ভার গ্লান্স, রুবি সিল্‌ভার, স্টিফেনাইট, হর্নসিল্‌ভার প্রভৃতি খনিজ আকারে রূপা পাওয়া যায়। রূপাকে পারদ-সংকর পদ্ধতি দ্বারা অতি সহজেই আকরিক হইতে পৃথক করা যায়।

রূপার ধর্ম—বিশুদ্ধ রূপা উজ্জ্বল সাদা রঙের ধাতু। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা অত্যন্ত নরম থাকে। ইহাকে সহজেই খুব চকচকে পালিশ করা যায়। ইহা তাপ ও বিদ্যুতের সু-পরিবাহক। বিশুদ্ধ জল বা বায়ু রূপার উপর কোন ক্রিয়া করে না।

রূপার ব্যবহার—গহনা প্রস্তুত কার্যে, মুদ্রা নির্মাণের কার্যে, বাসনপত্রাদি নির্মাণে, রূপার দর্পণ নির্মাণে ইহার ব্যবহার হয়।

রূপা বিশুদ্ধ অবস্থায় অত্যন্ত নরম থাকে বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ তামার সহিত মিশাইয়া শক্ত সংকর ধাতুতে পরিণত করিয়া উল্লিখিত কার্যে ব্যবহার করা হয়।

স্বর্ণ

(Gold)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। স্বর্ণ পৃথিবীতে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের নিকটবর্তি কোলারে স্বর্ণের খনি আছে। ভারতবর্ষের সুবর্ণরেখা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়।

স্বর্ণের ধর্ম—বিশুদ্ধ স্বর্ণ উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯.৩। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা অত্যন্ত নরম এবং অতি সহজেই ইহাকে

পাত বা যে-কোন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। জল বা বায়ু স্বর্ণের সহিত কোন ক্রিয়া করে না। প্রায় সব অ্যাসিডেই ইহা দ্রব হয় না একারণ অ্যাসিডের দ্বারা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অত্যন্ত নরম থাকে বলিয়া ইহাকে তামা, রূপা প্রভৃতির সহিত সংকর ধাতুতে পরিণত করিয়া কাজে লাগানো হয়।

স্বর্ণের ব্যবহার—গহনা প্রস্তুত, মুদ্রা প্রস্তুত, সংকর ধাতু প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যে স্বর্ণের ব্যবহার হয়।

সংকর ধাতু
(Alloys)

দুই বা ততোধিক ধাতুর বিশেষ বিশেষ অনুপাতের সংমিশ্রণে যে যে নূতন ধাতু-মিশ্রণ প্রস্তুত হয় তাহাকে **সংকর ধাতু** বা 'অ্যালয়্' বলে। পিতল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ, জার্মান-সিল্‌ভার প্রভৃতি সংকর ধাতু। এখানে আমরা কেবলমাত্র পিতল ও কাঁসার কথা বলিব।

পিতল—ইহা একটি সংকর ধাতু। নির্দিষ্ট অনুপাতে তামা ও দস্তা মিশাইয়া পিতল তৈয়ারি করা হয়। বাসনপত্র নির্মাণে ও গৃহস্থালির আরও অন্যান্য প্রয়োজনে পিতল ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ইংরেজীতে 'ব্রাস' বলা হয়।

কাঁসা—নির্দিষ্ট অনুপাতে তামা ও দস্তা মিশাইয়া কাঁসা নামক সংকর ধাতু প্রস্তুত করা হয়। বাসনপত্র নির্মাণে কাঁসার প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। কাঁসার দ্বারা নানাপ্রকারের ঘণ্টা প্রস্তুত হয় বলিয়া কাঁসার ইংরাজী নাম 'বেল-মেটাল'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীব-বিজ্ঞান

সজীব ও নির্জীব পদার্থ

তোমরা চারিধারে যে-সব পদার্থ দেখিতে পাও তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রাণ আছে, আর কতকগুলির প্রাণ নাই। যাহাদের প্রাণ আছে—যেমন গাছপালা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি—তাহাদিগকে **সজীব পদার্থ** বলা হয়। আর যাহাদের প্রাণ নাই—যেমন জল, বায়ু, মাটি, ঘরবাড়ী, পাহাড়, নদী ইত্যাদি—তাহাদিগকে **নির্জীব** বা **জড় পদার্থ** বলা হয়।

জীব-বিজ্ঞান ও তাহার শাখা—যে বিজ্ঞান দ্বারা আমরা সজীব পদার্থ-বিষয় জানিতে পারি তাহাকে **জীব-বিজ্ঞান** (Biology) বলে। ইহাতে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহ ও জীবনের বিষয়গুলি আলোচিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-বিষয়ক উপাখ্যানকে **উদ্ভিদ-বিদ্যা** (Botany) ও প্রাণি-বিষয়ক উপাখ্যানকে **প্রাণি-বিদ্যা** (Zoology) বলে।

সজীব পদার্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(Special Characteristics of the Living)

(১) সজীব পদার্থ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহই এক অথবা বহু কোষে (cell) নির্মিত। এই কোষ এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। প্রত্যেক কোষে স্বচ্ছ হড়হড়ে জেলির মত **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) নামক একপ্রকার জৈব পদার্থে পূর্ণ। এই প্রোটোপ্লাজম প্রাণশক্তির আধার। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একটি বিন্দুবৎ বিশিষ্ট অংশ দেখা যায়। ইহাকে **নিউক্লিয়াস** (nucleus)

বলে। ইহা প্রোটোপ্লাজমের প্রধান কার্যগুলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং নূতন নূতন কোষের সৃষ্টিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। নির্জীব পদার্থের ভিতর ঐরূপ প্রোটোপ্লাজম নাই।

(২) **নড়াচড়ার শক্তি** (Movement)—উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নড়াচড়া করিবার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চলনশক্তি না থাকিলেও, উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি স্থির নহে। উদ্ভিদের মূল মাটির নীচে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদূর চলিয়া যায়। কাণ্ড আলোকের অন্বেষণে উপর দিকে সোজা বর্ধিত হয় অথবা একদিকে নুইয়া পড়ে। কোন কোন লতা পাতার সাহায্যে আলোক ধরিবার জন্য অন্য বৃক্ষে বা আশ্রয়ে আরোহণ করে। কতকগুলি লতা আকর্ষ দ্বারা কোন আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ধরে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি উদ্ভিদের নড়াচড়ার দৃষ্টান্ত। প্রাণীগণ নিজের ইচ্ছামত আহার অন্বেষণের জন্য ও অন্যান্য কারণে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে পারে। নিজের ক্ষমতায় ও প্রবৃত্তির বশে নড়াচড়া করা সজীব পদার্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(৩) **চেতনা-শক্তি**—বাহির হইতে আঘাত ও উত্তেজনা পাইলে নানাপ্রকারের সাড়া দিবার ক্ষমতাকে চেতনা শক্তি বলে। সজীব পদার্থের মধ্যে অল্প বা অধিক পরিমাণে চেতনা-শক্তি দেখা যায়। ইহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। ইহারা শীত ও তাপ অনুভব করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের মধ্যে তোমরা এইরূপ শক্তির পরিচয় পাইয়া থাক। লজ্জাবতী লতাকে ছুঁইলে উহা সঙ্কুচিত হয়, একটি কেন্নুইকে স্পর্শ করিলে উহা কিছুক্ষণ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহারকে **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া** বলে। জড় পদার্থে তোমরা এইরূপ চেতনা-শক্তির পরিচয় পাইবে না।

লজ্জাবতী গাছের পাতা স্পর্শ করিলেই বুজিয়া যায় ও নুইয়া পড়ে। কালকাসুন্দা, চাকুন্দা, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের পাতা

অন্ধকারে গুটাইয়া পড়ে এবং আলোতে পুনরায় খুলিয়া যায়। কতকগুলি ফুল দিনের আলোতে ফোটে এবং অন্ধকারে মুদ্রিত হয়। আবার কতকগুলি রাত্রে ফোটে ও দিনের আলোতে বুজিয়া থাকে।

(৪) **পুষ্টি ও বৃদ্ধি**—উদ্ভিদ বায়ু, মাটি ও জল হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। প্রাণীরাও নানা রকম প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সজীব পদার্থ অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ, জন্মিবার পর হইতে আহার গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে ও কিছুকাল ধরিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নির্জীব পদার্থ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি নাই।

(৫) **শ্বাস-প্রশ্বাস** (Respiration):—জীবমাত্রেরই শ্বাস-প্রশ্বাস আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী কাহারও মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহস্থিত প্রোটোপ্লাজম বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অক্সিজেন প্রোটোপ্লাজমের সহিত মিলিত হয় ও তাহার ফলে প্রোটোপ্লাজম বিশ্লেষিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপ উৎপন্ন হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে প্রোটোপ্লাজমে যে শক্তি আবদ্ধ ছিল, তাহা বিমুক্ত হয়। এই আবদ্ধ শক্তির কিয়দংশ তাপের আকারে বাহির হইয়া যায় এবং কতকটা প্রোটোপ্লাজমের নানাকার্য্যে নিয়োজিত হয়। এই সমুদয় কার্য্যের নাম শ্বাস-প্রশ্বাস। মূলতঃ বাহির হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং শরীর হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিমোচন কে শ্বাস-প্রশ্বাস বলা হইয়া থাকে। মৎস্য ফুলকা দ্বারা জলে মিশ্রিত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। মানুষ, পশুপক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি স্থলচর জন্তু, মুক্ত বাতাস হইতে ফুসফুস্ দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও পরে বাতাসেই কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

উদ্ভিদদিগের ফুস্‌ফুস্ অথবা ফুলকা নাই, কিন্তু তথাপি উহারা বায়ু হইতে অক্সিজেন শোষণ করে ও শরীর হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। জলবাসী উদ্ভিদ জলে মিশ্রিত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও জলের ভিতর কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ-দেহের সকল অংশেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হয়। কেবল কোন কোন অংশে শ্বাস-প্রশ্বাস বেশী হইয়া থাকে। পাতা, ফুল, কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ এবং যে অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ অংশেই শ্বাস-প্রশ্বাস বেশী হইয়া থাকে।

এই শ্বাস-প্রশ্বাস সজীবতার একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা দিবারাত্র সকল সময়ই অবিরাম গতিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত বা নির্জীব পদার্থে এইরূপ দেখা যায় না।

(৬) **দূষিত পদার্থ ত্যাগ** (Excretion)—সজীব পদার্থ মাত্রই শরীর হইতে দূষিত পদার্থ ত্যাগ করিয়া দেয়। আমাদের শরীরের দূষিত পদার্থ যেমন মূত্র, ঘাম, নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রভৃতি আমরা ত্যাগ করিয়া থাকি, সেইরূপ অন্যান্য প্রাণীও তাহাদের শরীর হইতে মূত্র, অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রভৃতি নিয়মিতভাবে ত্যাগ করে। উদ্ভিদও তাহাদের শরীর হইতে দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে। তোমরা অনেক গাছের আঠা পড়িতে বা গাছ হইতে দুধের মত ও অন্য নানা রকমের রস বাহির হইতে দেখিয়াছ। ঐরূপ আঠা বা দুধের মত নানা রকমের রস গাছের দূষিত পদার্থ। এ ছাড়া গাছের 'ছাল' তোমরা সকলেই দেখিয়াছ উহাও গাছের দূষিত পদার্থ। উদ্ভিদের দেহ হইতে রস বাহির হইয়া ঐরূপ 'ছাল' হয়।

নির্জীব পদার্থের শরীর হইতে ঐরূপ কোন দূষিত পদার্থ বাহির হয় না।

(৭) **প্রজনন শক্তি** (Reproduction)—সজীব পদার্থ মাত্রেরই প্রজনন শক্তি থাকে। একটা গাছের এক বা ততোধিক সদৃশ

গাছ সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে। সেইরূপ একটা প্রাণীরও এক বা ততোধিক সদৃশ প্রাণী সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। সজীব পদার্থের এই সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাকে প্রজনন শক্তি বলা হয়। বংশ রক্ষার ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সজীব পদার্থের প্রজনন ক্রিয়ার প্রয়োজন।

কতকগুলি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীর বিভক্ত হইয়া বা শরীরের অংশবিশেষ বিচ্যুত হইয়া নূতন সন্তানের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম **অযৌনপ্রজনন** (asexual propagation)। অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি পুংকোষ ও একটি স্ত্রীকোষ বা ডিম্বের মিলন দ্বারা নূতন সন্তানের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **যৌন প্রজনন** (sexual propagation) বলে। কোন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর স্ত্রীকোষ বা ডিম্ব, পুংকোষের সহিত মিলিত না হইয়াও নূতন সন্তানের সৃষ্টি হয়। উহাকে **উদ্ভট প্রজনন** (parthenogenesis) বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের মধ্যে এরূপ নানা প্রণালীতে বংশধরগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

নির্জীব পদার্থের প্রজনন শক্তি নাই।

(৮) **মৃত্যু** (Death)—জীবমাত্রই যতকাল সম্ভব বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু অবশেষে জীবমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত।

সজীব ও নির্জীব পদার্থের প্রভেদ :—

সজীব	নির্জীব
১। প্রটোপ্লাজম আছে	১। প্রটোপ্লাজম নাই।
২। নিজের ক্ষমতায় ও প্রবৃত্তির বশে নড়াচড়া করিতে পারে।	২। নিজের ক্ষমতায় ও প্রবৃত্তির বশে নড়াচড়া করিতে পারে না।
৩। আহার গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বর্ধিত হয়।	৩। আহার দ্বারা বৃদ্ধি হয় না।

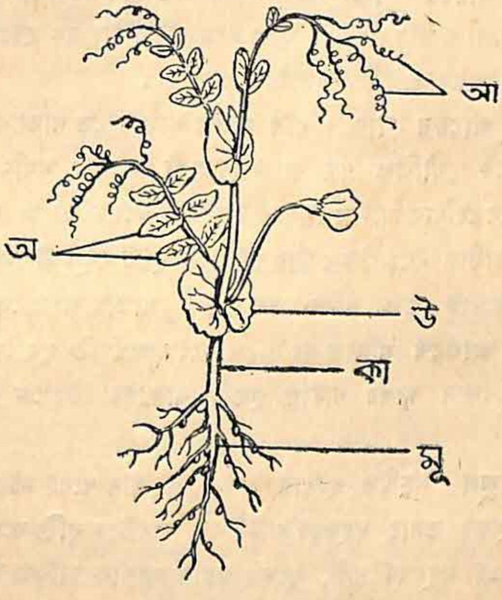
সজীব	নির্জীব
৪। অল্পবিস্তর চেতনা-শক্তি আছে, উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া আছে।	৪। ঐরূপ কোন শক্তি বা উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া নাই।
৫। শ্বাস-প্রশ্বাস আছে।	৫। শ্বাস-প্রশ্বাস নাই।
৬। দেহ হইতে দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে।	৬। কোনরূপ দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে না।
৭। প্রজনন শক্তি আছে, বংশবৃদ্ধি করিতে পারে।	৭। প্রজনন শক্তি নাই। বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না।
৮। জীবন আছে সুতরাং মৃত্যু আছে।	৮। জীবন নাই অতএব মৃত্যুও নাই।

উদ্ভিদ-বিদ্যা

সজীব পদার্থের দুই ভাগ—উদ্ভিদ ও প্রাণী। উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ও উহার বিভিন্ন অংশের নাম তোমরা জান; এইস্থানে উদ্ভিদের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইবে।

মটর গাছ

মটর গাছের মূল—মটরগাছের মূল মাটি হইতে সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, প্রধান বা আসল মূল হইতে কতকগুলি



মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

মু—মূল ও মূলের গুটি, কা—কাণ্ড, উ—উপপত্র, অ—অণুফলক, আ—আকর্ষ।

শাখা মূল বাহির হইয়াছে। মটর ও ঐ জাতীয় গাছের মূল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহাদের গায়ে এক প্রকার **গুটিকা** আছে। এক-

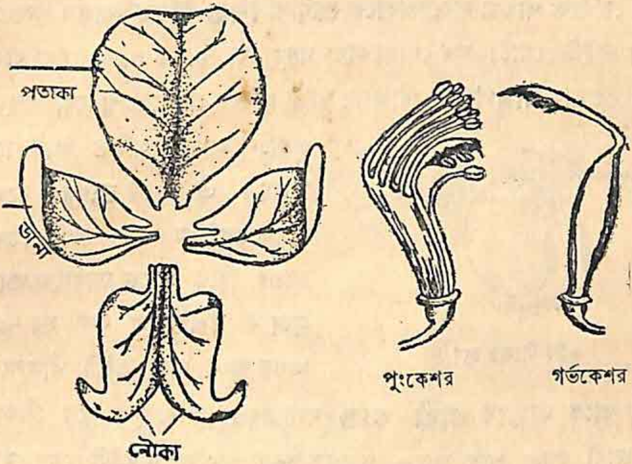
প্রকার বীজাণুর দ্বারা ঐ গুটিকা সমূহ উৎপন্ন হয়। বীজাণুগুলি বায়ু হইতে **নাইট্রোজেন** গ্রহণ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং শুঁটি জাতীয় গাছের মূলের ভিতর ঐ প্রকার খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। গাছ ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয় এবং উহার বিনিময়ে বীজাণুদিগকে শ্বেতসার ও শর্করাদিঘটিত খাদ্য প্রদান করে। মটর গাছ কাটিয়া ফেলিবার পরও উহার মূল মাটিতে থাকিয়া যায়। ঐ মূলের মধ্যে যে পুষ্টিকর খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহার দ্বারা ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ে।

মটর গাছের কাণ্ড—মটর গাছের কাণ্ড বেশ নরম, সরু ও তাহার ভিতরটা ফাঁপা ও রংও সবুজ। কাণ্ড নরম বলিয়া গাছ বড় হইলে মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

মটর গাছের পাতা—মটর গাছের কাণ্ড হইতে পাতা বাহির হয়। এই পাতাকে **যৌগিক** পত্র বা **বহুফলকী** পত্র বলে, অর্থাৎ ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, একটি পাতায় কয়েক জোড়া **অণুফলক** আছে। পাতার নীচে ঠিক বোঁটার দুই ধারে দুইটি সবুজ **উপপত্র** থাকে। উহাকে অনেকে পাতা বলিয়া ভুল করে। পাতার অগ্রভাগের কয়েকটি অণুফলক **আকর্ষে** পরিণত হয়। আকর্ষের স্পর্শশক্তি খুব বেশী; কঞ্চি বা ঐরূপ কোন আশ্রয় পাইলে কুণ্ডলি পাকাইয়া উহাকে আঁকড়াইয়া ধরে।

মটরফুল—অঙ্কুরিত হইবার প্রায় এক মাস পরেই মটর গাছে ফুল ধরে। ফুলের তলায় সবুজবর্ণ বাটির মত অংশটিকে **বৃতি** বলে। মুকুল অবস্থায় এই সবুজবর্ণ বৃতি, ফুলের অন্যান্য অংশকে ঢাকিয়া রাখিয়া রক্ষা করে। ফুল ফুটিলে **দল মণ্ডল** প্রকাশিত হয়। কোন কোন মটর ফুলের দল শ্বেতবর্ণ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দলগুলি বেগুনি বা নীল-বেগুনি রঙের হইয়া থাকে। দল মণ্ডলে পাঁচটি ভিন্ন প্রকারের **পাপড়ি** আছে। পশ্চাদভাগের পাপড়িটি সর্বাপেক্ষা বড়, ইহার নাম **পতাকা** বা **ধ্বজা**।

ইহাই সর্বাগ্রে মক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পতাকার দুই পার্শ্বের দুইটি ছোট পাপড়িকে **ডানা** বলে। এই দুইটি ডানার মধ্যে সম্মুখের দিকে দুইটি যমজ পাপ্‌ড়ি থাকে; উহাদের নাম **নৌকা**। ইহাদের **দশটি**



মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ

পুংকেশর ও একটি গর্ভকেশর ইহাদের ঐ নৌকার ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। দশটি পুংকেশরের মধ্যে নয়টি সংযুক্ত ও একটি পৃথক। সংযুক্ত পুংকেশরগুলি আবার গর্ভকেশরকে ঘিরিয়া থাকে।

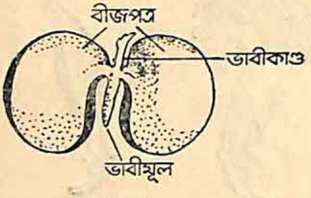
মটর বীজ—একটি ভিজা নরম মটর বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে



মটর বীজ (খোসা ছাড়াইবার পর)

দেখিবে যে, বীজটি একটি পাতলা খোসা দিয়া ঢাকা। খোসার উপর দিকে একটি দাগ দেখিবে, এই দাগকে **প্রবীজ নাভী** বলে। ইহা দ্বারা

বীজটি ফলের সঙ্গে আটকানো থাকে। প্রবীজ-নাভীর পার্শ্বেই একটা খুব ছোট ছিদ্র আছে, উহাকে **ডিম্বক রন্ধ্র** বলে। বীজের 'কল' এই ডিম্বক রন্ধ্রের ভিতর দিয়াই প্রথমে বাহির হয়। খোসাটি ছাড়াইলে বীজের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে **ভ্রূণ** বা **শিশু উদ্ভিদ** বলে। ভ্রূণের মধ্যে দুইটি মোটা অর্ধ-গোলাকার সবুজ বা পীতাভ পাতা দেখা যায়। উহাদের নাম **বীজপত্র**। বীজপত্র দুইটি খুলিলে দেখিতে পাইবে, উহারা

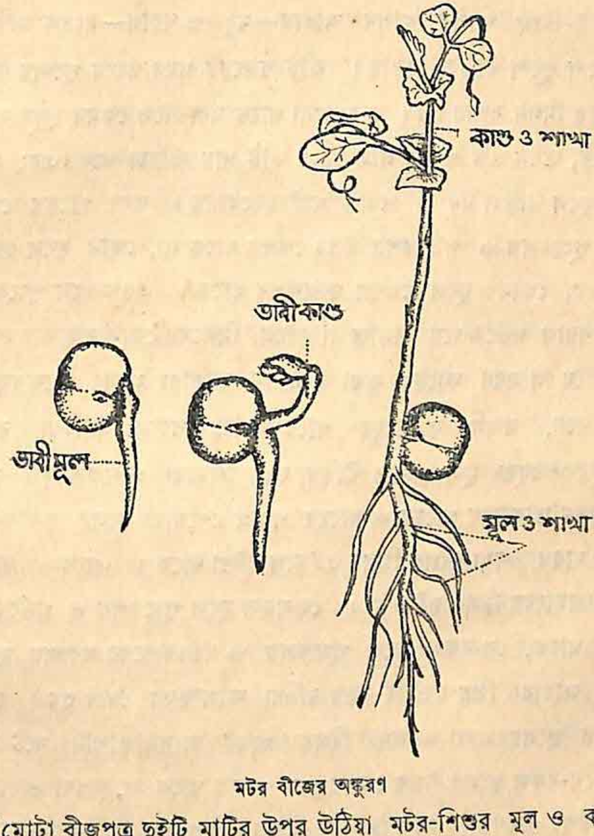


মটর বীজের ভ্রূণ

একটি দণ্ডের সহিত আটকানো আছে। ঐ দণ্ডকে **ভ্রূণদণ্ড** বলে। ভ্রূণদণ্ডের যে সরু অংশ ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে থাকে তাহাকে **ভাবী মূল** বা **শিশুমূল** বলা হয় এবং অপর অংশ যাহা দুইটি বীজপত্রের মধ্যে থাকে তাহাকে **ভাবী কাণ্ড** বলা হয়। ভাবী মূল পরে শিকড়ে ও ভাবী কাণ্ড পরে কাণ্ডে পরিণত হয়। বীজপত্র দুইটি বেশ মোটা ও শাঁসাল, শিশু উদ্ভিদের খাদ্য ইহার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। সেইজন্য ইহাদিগকে **অন্তঃসার বীজ** বলা হয়।

মটর বীজের অঙ্কুরণ—মটরের সুপক্ক বীজ, জল, বাতাস ও উপযুক্ত তাপ পাইলে দুই দিনেই অঙ্কুরিত হয়। বীজের খোসা জল শোষণ করিয়া নরম হয়। উহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করে ও ভ্রূণের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয়। দুইটি বীজপত্রে যে কঠিন ও দুষ্পাচ্য খাদ্য থাকে, তাহা এখন জল, বায়ু ও এক প্রকার পাচক-রসের সাহায্যে কোমল ও সুপাচ্য হয়। ভ্রূণ এই খাদ্য গ্রহণ করিয়া বড় হয়, এবং ঐ ভাবী মূল ও কাণ্ড খোসার ছিদ্র দিয়া অথবা খোসা ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকে। ভাবীমূল নীচের দিকে বর্ধিত হইয়া সরল মূলের আকার ধারণ করে, এবং মাটি হইতে রস শোষণ করিবার জন্য উহাদের গায়ে রোম উৎপন্ন

হয়। প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহা একটি টুপির দ্বারা সুরক্ষিত; এজন্য উহা মাটির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সহজে আহত হয় না। টুপির নাম মূলত্রাণ। ভাবী কাণ্ড আলো পাওয়ার জন্য উপরের দিকে বাড়িয়া থাকে ও সবুজ পত্র ধারণ করে। খাদ্য-



মটর বীজের অঙ্কুরণ

পূর্ণ মোটা বীজপত্র দুইটি মাটির উপর উঠিয়া মটর-শিশুর মূল ও কাণ্ডকে কিছুকাল খাদ্য প্রদান করে এবং সমুদয় খাদ্য নিঃশেষ হইলে শুকাইয়া যায়। তখন মটর গাছ ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের প্রয়োজনীয়

সমুদয় খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে।

ফুলের পরাগ সংযোগ (Pollination)

কীট-পতঙ্গ আপন আপন আহার—মধু ও পরাগ—সংগ্রহ করিবার জন্য পুষ্পে পুষ্পে উড়িয়া বেড়ায়। কীট-পতঙ্গের গমনাগমনে পুষ্পের উভয় কেশরের মিলন সম্পন্ন হয়। দেখ, শসা গাছে বর্ষাকালে কেমন হলুদ বর্ণের ফুল ফুটে, তখন এক প্রকার লাল রঙের কীট গাছ ভরিয়া বসে এবং ফুলে হইতে ফুলে উড়িয়া মধু ও পরাগ খাইয়া বেড়ায়। শসা গাছের কোন ফুলেই পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয় কেশর থাকে না, কোন ফুলে কেবল পুংকেশর, কোনও ফুলে কেবল গর্ভকেশর থাকে। এরূপ স্থলে পুংকেশর হইতে পরাগ গর্ভকেশরে আনীত না হইলে, মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। উপরে যে লালবর্ণ কীটের কথা বলিলাম তাহারা যখন পুংকেশরযুক্ত ফুলে বসে, তখন তাহাদের গায়ে পায়ে পরাগ লাগিয়া যায়। সেই পুংকেশরযুক্ত ফুল হইতে উড়িয়া যখন তাহারা গর্ভকেশরযুক্ত ফুলে বসে, তখন তাহাদের গায়ের ও পায়ের পরাগ শেষোক্ত ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়া যায়। শসা ফুলের মিলন এইরূপে হইয়া থাকে। এরূপ না হইলে আদৌ তাহাদের মিলন হইত না। যে-সকল ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে, সে-সকল ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশরের পরস্পর মিলন, কীটের সাহায্য ভিন্ন হওয়াই সম্ভব বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু সে-সকল ফুলের নানা কারণে মিলন প্রায়ই আপনাআপনি ঘটে না। কারণ সে-সকল ফুলের উভয় কেশর এক সময়ে পাকে না, অথবা তাহাদের উভয় কেশর এরূপভাবে সাজানো যে একের সহিত অপরের আপনাআপনি মিলন হওয়া একেবারে অসম্ভব। দেখ, পিঙ্ক ফুলে পুংকেশর পাকিয়া ঝরিয়া পড়িলে পর গর্ভকেশর পাকে; চিতা, রাঙচিতা ও কচুফুলে গর্ভকেশর

পাকিয়া শুকাইলে পর পুংকেশর পাকে। অনেক অর্কিড ফুলে পুংকেশরের রেণুস্থলী ও গর্ভকেশরের মুণ্ড এমনভাবে সাজানো যে, উভয়ের মিলন কখনও আপনাআপনি হইতে পারে না। এ-সকল স্থলে মিলনের জন্য বাহ্য সাহায্য আবশ্যক। কীট-পতঙ্গ মধু ও পরাগের লোভে এই-সকল ফুলে গমনাগমন করে ও সেই সঙ্গে এক ফুলের পরাগ তাহাদের গায়ে লাগিয়া অন্য ফুলের মুণ্ডে আনীত হয়। এইরূপে এই-সকল ফুলের মিলন হইয়া থাকে।

পরাগ সংযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে হইয়া থাকে :—

(১) **কীট-পতঙ্গের দ্বারা** (Entomophilous) :—মৌমাছি, প্রজাপতি ও পিপীলিকা, মিলন কাজের প্রধান সহকারী বটে, কিন্তু ইহারা আপন আপন গড়ন অনুসারে আপনার উপযুক্ত ফুল বাছিয়া লয়। পিপীলিকা ক্ষুদ্র, ইহারা যে ফুলে প্রবেশ করিতে পারে, মৌমাছি সে ফুলে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজাপতির শুঁড় লম্বা, মৌমাছির শুঁড় অপেক্ষাকৃত ছোট, কাজেই যে ফুলে মধু নালাকার পাপড়ির খুব নীচে থাকে, সে ফুলে মৌমাছি শুঁড় ঢুকাইয়া মধু সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু প্রজাপতি পারে। কোন ফুলের পাপড়ির এরূপ গড়ন যে, প্রজাপতি সে ফুলে পাখা লইয়া বসিতে পারে না, অথচ মৌমাছি পারে। এই ফুলের পাপড়ির গড়ন প্রজাপতির প্রতিকূল, কিন্তু মৌমাছির অনুকূল। অতএব ফুলের রঙ ও গড়ন এবং কীট-পতঙ্গের গড়ন ও প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। এমন কি কীট-পতঙ্গের গড়ন ও প্রকৃতি অনুসারে পুষ্পের গড়ন, রঙ ও গন্ধ প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ফল কথা এই দাঁড়াইতেছে, কীট-পতঙ্গ ফুলের উপকারী এবং ফুল কীট-পতঙ্গের উপকারী।

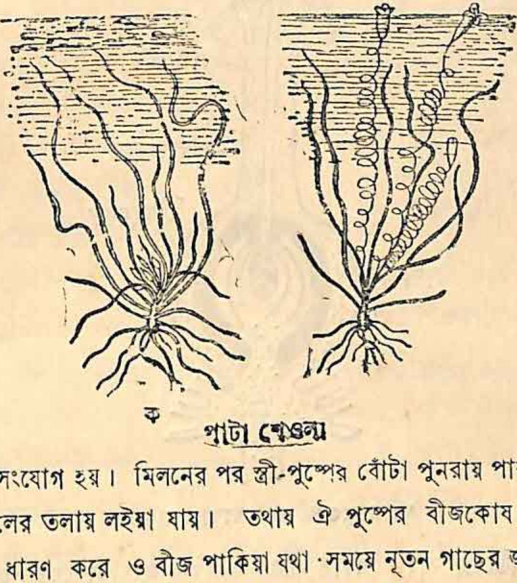
(২) **প্রাণীর দ্বারা** (Zoophilous) :—যে-সকল গাছে বড় লাল টকটকে ফুল হয়, সে-সকল গাছে কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী দলে দলে আসিয়া বসে এবং কাঠবিড়ালীও পালে পালে উঠা-নামা করে,

আর যে সময়ে ফুল ফুটে সে সময় গাছের পাতা প্রায় ঝরিয়া পড়ে ; সেজন্য লাল টকটকে ফুলের রাশি বহুদূর হইতে দেখা যায়। সেই টকটকে ফুলের রঙ দেখিয়া পাখীসকল ও কাঠবিড়ালী ঐ-সকল গাছে যাতায়াত করে ও তাহাদের সাহায্যে ফুলের উভয় কেশরের মিলন হয়। পালতেমাদার, কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া প্রভৃতি ফুলে ঐরূপে প্রাণীর দ্বারা পরাগ সংযোগ হইয়া থাকে।

(৩) **বায়ুর দ্বারা** (Anemophilous) :—বায়ুর সাহায্যে যে-সকল উদ্ভিদের মিলন হয়, তাহাদের পুষ্পের গড়ন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের ফুল ক্ষুদ্র, অনুজ্জ্বল ও মধুহীন। তাহাদের পরাগ বহু পরিমাণে জন্মে, কারণ বায়ুতে ভাসিয়া যাইবার সময় বৃষ্টিতে ও বায়ুর স্রোতে অনেক পরাগ কোথায় গিয়া পড়ে ও নষ্ট হয়, তাহার ঠিকানা নাই। তা ছাড়া ইহাদের পরাগ খুব হালকা, শুষ্ক ও আঠাহীন, সেজন্য বায়ুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাসিয়া থাকে। ইহাদের মুণ্ড প্রায় বড় ও শাখাযুক্ত—যেমন রেড়ির ফুল ও ধান প্রভৃতি ঘাসের ফুল। বায়ুর সাহায্য যে-সকল গাছের মিলন হয়, সে-সকল গাছের পাতা মিলনের সময় ঝরিয়া পড়ে, তাহাতে উভয় কেশরের অবাধে মিলন হয়—যেমন শিমূল, বড় কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। আম, অমড়া, লিচু, জাম, জামরুল, দেশী বাদাম প্রভৃতি গাছের ফুল প্রায়ই বায়ুর সাহায্যে মিলিত হয়।

(৪) **জল দ্বারা** (Hydrophilous) :—যে-সকল গাছ জলে জন্মে, তাহাদের ফুলের মিলন প্রায়ই **জলের সাহায্যে** হইয়া থাকে। এই-সকল গাছের মধ্যে পাটা শেওলা (Vallisnaria spiralis) গাছের মিলন অতি বিচিত্র। ইহার গোছা-বাঁধা মূল পুকুরের পাঁকে পোঁতা থাকে। মূলের উপরিস্থ ক্ষুদ্র কাণ্ড হইতে পাতার গোছা বাহির হইয়া জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। পাতা-সকল তিন-চারি হাত দীর্ঘ ও প্রায় আধ আঙ্গুল চওড়া। পাতার গোছার মধ্যে মাটির কাছে ফুল ধরে। এক গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প (খ), আর এক গাছে কেবল পুং-পুষ্প (ক)। পুং-পুষ্পের বোঁটা নাই,

স্ত্রী-পুষ্পের দীর্ঘ বোঁটা। স্ত্রী-পুষ্পের এই বোঁটা স্ক্রুর মত পাক খাইয়া ফুলকে জলের তলায় রাখিয়া দেয়। মিলনের সময় উপস্থিত হইলে স্ত্রী-পুষ্পের বোঁটার পাক খুলিয়া যায় ফলে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে বৃন্তহীন পুং-পুষ্প গাছ হইতে পৃথক হইয়া জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন জলের উপরের পুং-পুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প উভয়ের মিলন



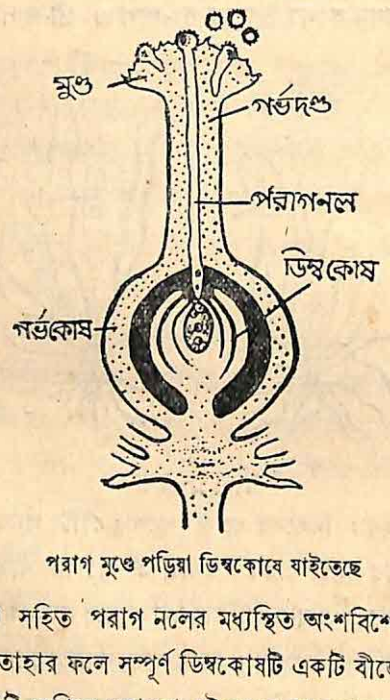
পাটা শেওলা

ও পরাগ সংযোগ হয়। মিলনের পর স্ত্রী-পুষ্পের বোঁটা পুনরায় পাক খাইয়া ফুলকে জলের তলায় লইয়া যায়। তথায় ঐ পুষ্পের বীজকোষ পাকিয়া ফলাকার ধারণ করে ও বীজ পাকিয়া যথা সময়ে নূতন গাছের জন্ম দেয়। অনেক পুকুরে পাটা শেওলা জন্মে। ইহার পাতা কাটিয়া লোকে ঝুড়িতে গুড় রাখিয়া তাহার উপর ঐ পাতা চাপা দেয়। ইহার ফলে তিন-চারি দিনের মধ্যে গুড় পরিষ্কৃত হইয়া চিনি হয়। এই চিনির ডাক নাম 'দোলো'।

বীজ ও ফলের উৎপত্তি

পরাগ বা রেণু গর্ভকোষের মুণ্ডে পতিত হইলে ঐ পরাগে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। ঐ পরাগ হইতে একটি নল উৎপন্ন হইয়া উহা ক্রমশঃ বড়

হইতে হইতে গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া গর্ভকোষে প্রবেশ করে। পরে গর্ভকোষস্থিত একটি ডিম্বকোষে আংশিকভাবে প্রবেশ করে। এই সময়ে ডিম্বকোষের মধ্যেও নানারূপ পরিবর্তন হয়। ইহার পর সেই ডিম্বকোষের

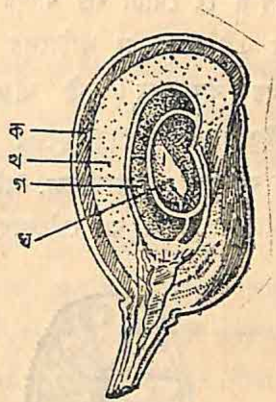


পরাগ মুণ্ডে পড়িয়া ডিম্বকোষে যাইতেছে

মধ্যস্থিত ডিম্বের সহিত পরাগ নলের মধ্যস্থিত অংশবিশেষের (কোষান্ধ) সংযোগ হয়। তাহার ফলে সম্পূর্ণ ডিম্বকোষটি একটি বীজে পরিণত হয়।

উপরের ছবিটি দেখিলে তোমরা এই সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিতে পারিবে। ফল অর্থাৎ পরিপক্ক বীজকোষ স্থূল বা মোটা হইলে তাহার খোসায় প্রায় তিন প্রকার তবক লক্ষিত হয়—বাহিরে এক তবক (epi-carp), মাঝে এক তবক (meso-carp) ও ভিতরে এক তবক (endo-carp)। দেখ, পাকা **আম** খাইবার সময় আমরা যে খোসা ফেলিয়া দি, তাহা বাহিরের তবক (ক); যে অংশ খাই, তাহা মাঝের তবক (খ);

এবং যে আঁটি ফেলিয়া দি তাহা ভিতরের তবক (গ)। এই ভিতরের তবক বা আঁটিকে ইংরেজীতে **স্টোন** (stone) বলে। আঁটি লম্বালম্বি চিরিলে উহার ভিতরে কষি দেখা যায়, উহাই বীজ (ঘ)।



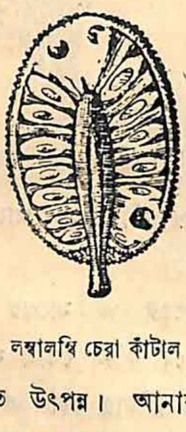
লম্বালম্বি চেরা আম

পাকা **খেজুরে** খোসার বাহিরের তবক চকচকে ও ঘোর লাল; এই তবকের পর দ্বিতীয় তবক, যাহা আমরা খাই; এই তবক চুষিয়া খাইতে যে পাতলা সাদা পর্দা বাহির হয় তাহা তৃতীয় তবক। তাহার ভিতরে কঠিন বীজ, যাহাকে আমরা খেজুর আঁটি বলি। দেখ, আমের আঁটি ও খেজুরের আঁটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। আমের আঁটি বীজকোষের খোলার তৃতীয় তবক, আর খেজুরের আঁটি প্রকৃত বীজ।

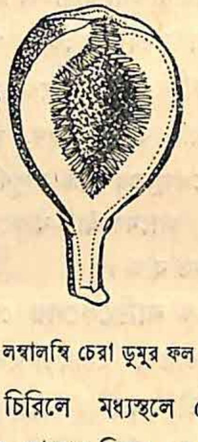
এইরূপ **নারিকেলের** ছোবড়া, বাহিরের ও মাঝের তবকের মিলনে প্রস্তুত, ছোবড়া ফেলিয়া দিলে যে কঠিন খোল বাহির হয় তাহা তৃতীয় তবক। এই তবক হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত হয়। এই খোলের ভিতর ফাঁপা সাদা জলভরা বীজ। বীজের সাদা অংশ যাহা আমরা খাই, বীজান্তর্গত সার।

ফুলের শীষ হইতে এক ফল :—উপরে যে-সকল ফলের বর্ণনা করিলাম, উহাদের সকলগুলিই এক একটি ফুল হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কাঁটাল, আনারস, ডুমুর, অশ্বথ ও বট প্রভৃতি ফলের গড়ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক গাছে ফুলের শীষ হয় ও ফুলের শীষের মাঝে একটা দণ্ড বা শির থাকে এবং বহু ফুল ঐ শিরে সজ্জিত থাকে, যেমন, সোঁদাল,

কাঁটানটে, পালঙ প্রভৃতি ফুলের শীষ। **কাঁটালের** মুচি যাহা বাড়িয়া ফল হয়, তাহা কাঁটালের ফুলের শীষ। পাকা কাঁটাল ভাঙ্গিলে মধ্যস্থলে যে মোটা দণ্ড বাহির হয়, তাহাই শীষের দণ্ড বা শির, আর এই শিরে যে কাঁটালের কোষ জোড়া থাকে, তাহারা এক একটি ফুলের বীজকোষ। ঐ বীজকোষ আবার পাতলা ভুতুড়ি দিয়া বেষ্টিত। ঐ ভুতুড়িই ফুলের পাপড়ি। এক এক কোষের মধ্যে এক এক বড় বীজ। **আনারস**, কাঁটালের ন্যায় ফুলের শীষ হইতে উৎপন্ন। আনারসের গায়ে বহু চৌকোণা অংশ দেখিতে পাও, উহা এক একটি



লম্বালম্বি চেরা কাঁটাল



লম্বালম্বি চেরা ডুমুর ফল

ফুল হইতে উৎপন্ন। আনারস লম্বালম্বি চিরিলে মধ্যস্থলে যে কঠিন অংশ বাহির হয়, তাহা আনারসের শীষের মাঝের শির। আনারসের চৌকোণা দাগযুক্ত খোসা ছাড়াইলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা ফুল-সমষ্টি হইতে উৎপন্ন, এবং এই অংশই আমরা খাই। ইহার মধ্যে লালবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বীজ থাকে। **ডুমুর** ফল ঘটির আকার বিশিষ্ট ও উহার মধ্যস্থলে ঘটির ন্যায় এক গহ্বর বা কুঠরি। ঐ ঘটিটি ফুল-সমষ্টির অর্থাৎ শীষের দণ্ড বা শির। ঐ শির ফাঁপা হইয়া ঘটির আকার ধারণ করে, আর ঐ ঘটির ভিতর-গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প সজ্জিত।

ঐ পুষ্পসকলের এক একটি হইতে এক একটি অতি ক্ষুদ্র সরিষার মত ফল উৎপন্ন হয়। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলগুলিকে আমরা ডুমুরের বীজ বলি, প্রকৃতপক্ষে উহারা বীজ নহে, এক একটি ফল। **অশ্বথ ও বট ফলের** গড়ন অবিকল ডুমুরের মত।

ফলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of fruits) :—আমরা নানা প্রকার ফলের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ফলের প্রধান কাজ একটি বা অনেকগুলি বীজকে অপক্ব অবস্থায় ধারণ ও পোষণ করা। সুপক্ব হইলে বীজগুলি ফল হইতে নানা উপায়ে বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে নানা প্রকার ফলকে নিম্নপ্রকারে শ্রেণীবিভাগ করা হইল :—

কমলালেবু, কুল, বেগুন, শিম, ছোলা প্রভৃতি গাছের ফলগুলি ফুলের একটি গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। যে-সকল ফল একটিমাত্র গর্ভকোষ হইতে উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে **মৌলিক ফল** (Simple fruit) বলে।

কোন কোন ফুলে অনেকগুলি গর্ভকেশর পৃথক ভাবে থাকে। এই পৃথক গর্ভকেশরগুলি পরাগ গ্রহণের পর এক একটি ফলাণু বা ক্ষুদ্র ফলে পরিণত হয় ; এই ফলাণুগুলি বাড়িতে বাড়িতে পরস্পরের সহিত মিশিয়া একটি বড় ফলে পরিণত হয়। এইরূপ ফলাণু-সমষ্টিকে **গুচ্ছফল** (Aggregate fruit) বলে। যেমন—আতা, নোনা ইত্যাদি।

কোন কোন ফল বহুপুষ্পের সম্মিলন দ্বারা উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে **বহুপুষ্পজ** বা **যৌগিক ফল** (Multiple fruit) বলে। যেমন—কাঁটাল, আনারস, ডুমুর ইত্যাদি।

মৌলিক ফলের মধ্যে কতকগুলি ফল পাকিলে ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। উহাদিগকে **শুষ্ক ফল** (dry fruit) বলে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আপনা হইতে ফাটিলে বীজগুলি বাহির হয়। যথা—শিম, কলাইশুঁটি, ধুতুরা ইত্যাদি। ইহাদিগকে বহুবীজী শুষ্ক **স্ফোটক ফল**

(dehiscent fruit) বলে। শুষ্ক ফলে একটিমাত্র বীজ থাকিলে সাধারণতঃ ফাটে না ; যেমন—ধান, গম, ভুট্টার দানা ইত্যাদি। ইহাদিগকে একবীজী শুষ্ক **অস্ফোটক ফল** (indehiscent fruit) বলে। মৌলিক ফলের মধ্যে আবার কতকগুলি ফল কোমল **রসাল** (fleshy) ; যেমন—আম, পেয়ারা, কুল, কমলালেবু ইত্যাদি। আম ও কুল একবীজী রসাল ফল ; পেয়ারা ও কমলালেবু বহুবীজী রসাল ফল।

ফলের কার্য :—বীজ হইতে উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হয়। কাজেই যাহাতে বীজের কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য বীজ ফলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আমরা যেমন টাকাকড়ি ও মূল্যবান জিনিস বাক্সের মধ্যে রাখি, উদ্ভিদ সেইরূপ আপন বীজ ফলরূপ বাক্সের মধ্যে রাখে, কারণ বীজ তাহাদের পক্ষে সবিশেষ মূল্যবান জিনিস।

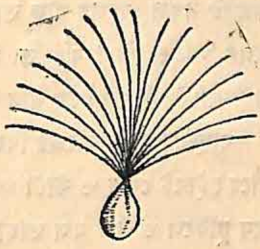
বীজ ও ফলের বিস্তার

বীজ ও ফল বিস্তারের উদ্দেশ্য :—বীজের উদ্দেশ্য উদ্ভিদের বংশ-রক্ষা ও বংশ-বিস্তার করা। উদ্ভিদের সকল বীজগুলিই যদি একস্থানে পতিত হয়, আর সেই স্থান যদি শিশু-উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে হয় কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় না, অথবা যদিও অঙ্কুরিত হয়, শিশু-উদ্ভিদ বাড়িতে পারে না। এইরূপে সেই উদ্ভিদের বংশলোপ হয়। অনেক ফল ও বীজ একস্থানে পড়িলে, সেই-সকল ফল ও বীজের চারা স্থানাভাবে পরস্পর মারামারি করিয়া ধ্বংস হয়। কিন্তু বীজ ও ফলসকল যদি একস্থানে না পড়িয়া নানাস্থানে পড়ে, তাহা হইলে কোন বীজ অনুকূল এবং কোন বীজ প্রতিকূল অবস্থা পায়। কাজেই সকল বীজ না হউক, কতকগুলি বীজ উপযুক্ত অবস্থা পাইয়া অঙ্কুরিত হয় এবং বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধি করে। অতএব বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির জন্য বীজের ও ফলের বিস্তার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে বীজ ও ফলের বিস্তার হয়—

(১) **বাতাসের দ্বারা**—অনেক গাছের বীজ ও অনেক গাছের ফল বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে নানা স্থানে গিয়া উড়িয়া পড়ে। আকন্দ, করবী, মালতী, কুড়চি প্রভৃতি গাছের ছোট বীজের মাথায় লম্বা সাদা কেশের গোছা থাকে ও শিমুল, কার্পাস প্রভৃতি গাছের বীজ কেশে ভরা থাকে।


কার্পাস-বীজ


আকন্দ-বীজ

পারুল, মেহগনি, ইণ্ডিয়ান কর্ক, ওক, আটকপালে, গর্জন প্রভৃতি গাছের বীজে পাতলা ও চওড়া পাখার মত অংশ জোড়া থাকে।

কুক্‌শিমা, গাঁদা, বনপালঙ, কুসুম প্রভৃতি গাছের ছোট ছোট কেশের


কুক্‌শিমার বীজ


গর্জন গাছের পক্ষযুক্ত ফল

গোছা অথবা পাতলা কাঁটার গোছা থাকে। গর্জন, মোহর প্রভৃতি গাছের ফলেও চওড়া পাখার মত অংশ জোড়া থাকে। সেই কেশের ও পাখার

সাহায্যে ঐ-সব বীজ ও ফল বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে যায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়ে।

(২) **পাখী ও অন্যান্য প্রাণীর** সাহায্যেও অনেক বীজ এবং ফল বহুদূরে ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হয়। তোমরা বোধ হয় জান, কাক, শালিক ও ময়না প্রভৃতি পাখী বট ও অশ্বত্থের ফল বড় ভালবাসে। কিন্তু ঐ-সকল ফলের বীজ তাহারা হজম করিতে পারে না, তাহাদের মলের সহিত উহা বহির্গত হয় এবং তাহারা যেখানে মলত্যাগ করে, সেইখানে ঐ বীজ হইতে গাছ জন্মে।

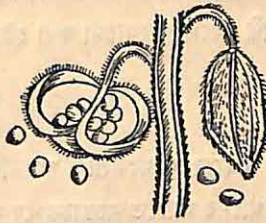
বাদুড়, ফল ও বীজের বিস্তারে সবিশেষ সাহায্য করে। ওকড়া ফলের গায়ে চট্চটে কেশ ও কাঁটা আছে, গরু-বাছুর বা অন্য কোন জন্তু ওকড়া বনে ঢুকিলে ওকড়া ফল তাহাদের গায়ে ও লেজে লাগিয়া যায়,—এইরূপে ঐ সকল ফল দূরে গিয়া পড়ে। আপাঙ গাছে কাপড় লাগিলে ফল গাছ হইতে খসিয়া কাপড়ে লাগিয়া যায়। চোরকাঁটা বা ভাঁটুই এক প্রকার ঘাস, ইহার ফল কিরূপে কাপড়ে বিঁধিয়া যায় ও বিস্তৃত হয়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। বাঘনখা গাছের ফল বাঘের নখের ন্যায় কাঁটার সাহায্যে বন্য জন্তুর গায়ে আট্কাইয়া যায়। এইরূপে শত শত ফল ও তাহার সহিত বীজ বহু দূরে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে পড়ে।


বাঘনখা ফল

মানুষও বীজের বিস্তারে অনেক সাহায্য করে। বাণিজ্যের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে নৌকা, জাহাজ ও রেলপথে আমরা কত জিনিস আনয়ন করি, আর সেই সঙ্গে আমাদের অজ্ঞাতসারে কত প্রকার গাছের বীজ ও ফল আসে। এইরূপে বীজের ও ফলের বিস্তার সাধিত হয়।

(৩) **জলদ্বারা**—নদী ও সমুদ্র, ফল ও বীজের বিস্তারের পক্ষে সাহায্য করে। যে-সকল ফল ও বীজ এইরূপে বিস্তৃত হয়, তাহাদের খোলা সাধারণতঃ

পুরু ও কঠিন হয়, নচেৎ ফল ও বীজের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া উহাদের অভ্যন্তরস্থ শিশু-উদ্ভিদ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। জলে ও জলের ধারে যে-সকল গাছ জন্মে, সেই-সকল গাছের ফলে নানারূপ কৌশল সবিশেষ লক্ষিত হয়। দেশী বাদাম, আচ বা আল, ছাগলকুরি, কেয়া, নারিকেল প্রভৃতি গাছের ফল অথবা বীজের খোলা পরীক্ষা করিলে দেখিবে, উহার মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে; সেইজন্য ইহারা জলে ভাসিয়া বহু দূরে স্রোতের দ্বারা নীত হয়।


দোপাটির ফল ও বীজ

(৪) স্ফোটক ফল দ্বারা—দোপাটি, ঝাঁটি, কুলেখাড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের ফল পাকিলে এরূপ জোরে ফাটে যে, বীজ বেশ দূরে গিয়া পড়ে এবং সেইখানে ঐ বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মে।

প্রাণী-বিদ্যা

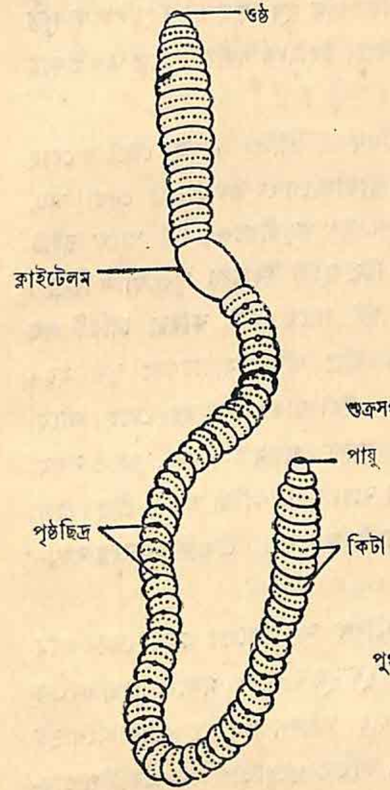
সজীব পদার্থের মধ্যে গাছ সম্বন্ধে দুই-একটি বিষয়ে তোমাদের বলা হইয়াছে। প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ তোমরা আগেই শিখিয়াছ। এখন কয়েকটি প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কেঁচো

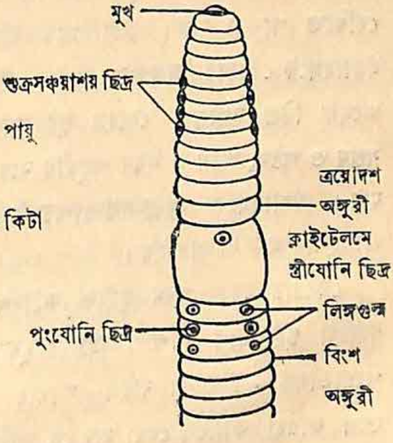
কেঁচো অমেরুদণ্ডী আনেলিডা পর্বভুক্ত। কেঁচে মাটিতে বাস করে। বাগানের মাটিতে সচরাচর যে-সকল গর্ত দেখা যায় কেঁচো তাহাদের বাসের জন্য সেইগুলি প্রস্তুত করে। গর্তগুলি প্রায় সোজাসুজি মাটির নীচে ১৮ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চির মধ্যে অবস্থিত। কেঁচো দিনের বেলায় গর্তে থাকে ও রাত্রিকালে আহারের খোঁজে গর্ত হইতে বাহির হয়। মাটি বা মাটির সহিত যে সকল জৈব পদার্থ থাকে, তাহা ইহারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

কেঁচোর দেহ—কেঁচোর দেহ লম্বা ও নলাকার। দেহের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি। ইহাদের সর্বশরীর মসৃণ ও উজ্জ্বল। ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, ইহাদের দেহ অঙ্গুরীর ন্যায় খণ্ডে বিভক্ত। ইহাদের দেহে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১২০টি অঙ্গুরীর ন্যায় খণ্ড থাকে। ইহাদের দেহের একস্থান সামান্য একটু বিভিন্ন। সেই স্থানটির নাম **ক্লাইটেলম**। ১৪, ১৫ ও ১৬ এই তিনটি অঙ্গুরী মিলিত হইয়া ঐ স্থানটি গঠিত। ক্লাইটেলমের অবস্থান দ্বারা কেঁচোর দেহের অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ সহজেই বুঝা যায়। ক্লাইটেলমের সামনে ১৩টি অঙ্গুরী থাকে। প্রথম অঙ্গুরী খণ্ডের পিঠের দিকে একটি খুব ছোট মাংসপিণ্ড দেখা যায়। ঐ ছোট মাংসপিণ্ডটিই কেঁচোর **ওষ্ঠ**। প্রথম খণ্ড ও ওষ্ঠের মধ্যে পেটের

দিকে যে ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাদের **মুখ** এবং দেহের সর্বশেষ অঙ্গুরীখণ্ডে যে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা **পায়ু** বা গুহ্যদ্বার। চলাফেরা করিবার জন্য ইহাদের সমস্ত দেহে এক প্রকার পদ



কেঁচোর পৃষ্ঠদেশ (dorsal side)



কেঁচোর উদরদেশ (ventral side)

বা পা আছে। ঐ পদগুলিকে **রোম** বা **কিটা** বলে। ইহা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ইহা থাকার প্রমাণ যে, কেঁচো হাতে ধরিয়া পিছন হইতে একটু টানিলে বেশ একটু খস্‌খসে বলিয়া মনে হয়। ক্লাইটেলম,

প্রথম অঙ্গুরী ও শেষ অঙ্গুরী ছাড়া ঐ রোম সকল অঙ্গুরীর মধ্যাংশ বেষ্টন করিয়া থাকে। কেঁচোর পিঠের দিকের মধ্যস্থলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অঙ্গুরীর যোজন-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দুই অঙ্গুরীর সংযোগ-স্থান পর্যন্ত কতকগুলি ছিদ্র দেখা যায়। ঐ ছিদ্রগুলি খুব ক্ষুদ্র। ইহাদিগকে **পৃষ্ঠ ছিদ্র** বলে; এই ছিদ্রগুলি দ্বারা কেঁচো উহাদের শরীর হইতে একপ্রকার রস বাহির করে।

কেঁচো **উভয়লিঙ্গ** অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একই কেঁচোর দেহে অবস্থিত। উদরদেশে ক্লাইটেলমের পুরোভাগে যে একটি ছিদ্র দেখা যায়, তাহা কেঁচোর **স্ত্রীযোনি ছিদ্র**। অষ্টাদশ অঙ্গুরীখণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ছিদ্র দুইটি ইহাদের **পুংযোনি ছিদ্র**। সপ্তদশ ও উনবিংশ অঙ্গুরীখণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ছিদ্র বলিয়া সাধারণতঃ ভুল হয়। ইহাদিগকে কেঁচোর **লিঙ্গগুল্ম** বলে। ইহা ছাড়া ইহাদের দেহে আরো অনেক ছিদ্র আছে। দেহের দুই পার্শ্বে পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম অঙ্গুরীর মধ্যে দুইটি করিয়া আটটি ছিদ্র দেখা যায়। ইহাদিগকে **শুক্রসঞ্চয়াশয় ছিদ্র** বলে। ঐগুলি ইহাদের সন্তান জন্মাইবার জন্য দরকার হয়।

কেঁচোর দেহ প্রথম হইতে অষ্টাদশ অঙ্গুরীখণ্ডের মধ্যে কোন স্থান কাটিয়া দুই ভাগ করিলে, তাহার মুখ নূতন করিয়া গজায়, কিন্তু কর্তিত পুরোভাগটি নষ্ট হইয়া যায়। আবার অষ্টাদশ অঙ্গুরীর পরের অংশ দুই ভাগ করিয়া কাটিলে দেখা যায় যে, কর্তিত পুরোভাগটিতে একটি পশ্চাদ্-ভাগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আর একটি নূতন পায়ু হয় এবং শেষের ভাগটিতে আর একটি পশ্চাদ্ভাগ গঠিত হয়। কিন্তু শেষটির মুখ না থাকায় ইহা অনাহারে মরিয়া যায়। অতএব কেঁচোকে কাটিয়া ফেলিলে কেঁচো সব সময়ে মরে না। ইহা ছাড়া তিনটি কেঁচোকে এমনভাবে জোড়া যায় যে,

তাহারা মিলিয়া একটি প্রকাণ্ড কেঁচোতে পরিণত হয়। ইহাকে কেঁচোর **জোড় কলম** বলে। একটি কেঁচোর পশ্চাদ্‌ভাগ আর একটি কেঁচোর পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত কলম করিলে দেখা যায়, ইহার দুইটি মুখ ও একটি পশ্চাদ্‌ভাগ গঠিত হইয়াছে।

কেঁচোর উপকারিতা—কেঁচো কৃষকের বিশেষ সহায়তা করে। এইরূপ কৃষক-সহায়ক প্রাণী আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অনেকেই মাঠে, বা পথের ধারে, কুণ্ডলী পাকানো মাটির ছোট ছোট **কেঁচোর ঢিপি** দেখিয়াছ; এইগুলি কেঁচোর পরিত্যক্ত বিষ্ঠা। যে স্থানে কেঁচো মাটি কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, সেখানে নীচের মাটি বিষ্ঠারূপে উপরে আসে ও সেই মাটি ক্ষেতে সারের কাজ করে।

মাছ

মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। সমুদ্রে, নদীতে, পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে যে কত প্রকার মাছ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হাঙ্গরও এক প্রকার সমুদ্রের মাছ।

মাছের দেহ—মাছের দেহ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। অধিকাংশ মাছের দেহে আঁশ থাকে। আঁশের উপর এক প্রকার পিচ্ছিল আচ্ছাদন থাকে; ইহাই ইহাদের বহিস্ত্বক্। মাগুর, শিঙ্গি, টেংরা প্রভৃতি কতকগুলি মাছের আঁশ নাই, কিন্তু ইহাদের দেহেও ঐরূপ পিচ্ছিল পদার্থ মাখানো থাকে। মাছের মাথার উপর দুই পার্শ্বে দুই চোখ, মাথার দুই পার্শ্বে কানকো দিয়া ঢাকা শ্বাসযন্ত্র বা ফুলকা, ও দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাখনা থাকে। পাখনার ভিতর কাঁটা থাকে, এইগুলি পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া। এই পাখনার মধ্যে এক জোড়া **বক্ষ-পাখনা** ও এক জোড়া **শ্রোণি-পাখনা** সব মাছেরই থাকে। এই **যুগ্ম** বা **জোড়া পাখনা** ও ঐরূপ **কাঁটাযুক্ত পাখনা মাছের একটি প্রধান**

বৈশিষ্ট্য। মাছের দেহে, কানকো হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্যন্ত দুই পার্শ্বে একটি করিয়া দুইটি লম্বা রেখা দেখা যায়; এই রেখা দুইটিকে **পার্শ্বরেখা** বলে। **এই পার্শ্বরেখাও মাছের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য**। এই রেখা দ্বারা মাছ স্পর্শ অনুভব করে। সব মাছের **হৃৎপিণ্ডে দূষিত রক্ত** থাকে। ইহাদের কানকোর ভিতর যে **ফুলকা** থাকে তাহার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস হয় ও রক্ত বিশুদ্ধ হয়। মাছের **পটকা** তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহা সর্বদা এক প্রকার বাষ্পে পূর্ণ থাকে। সেইজন্য পটকার সাহায্যে ইহারা ইচ্ছামত জলে ভাসিতে, চলাফেরা করিতে, উঠিতে ও নামিতে পারে।

স্ত্রী-মাছেরা ডিম পাড়ে। একটি বড় মাছের পেটে ৮।১০ লক্ষ ডিম হইতে পারে। ডিমের অর্ধেক প্রায় নিজেরা বা অন্য কোন মাছ খাইয়া ফেলে; বাকিগুলি অবশেষে দুই-তিন সপ্তাহ পরে ফুটিয়া ছোট ছোট বাচ্চায় পরিণত হয়।

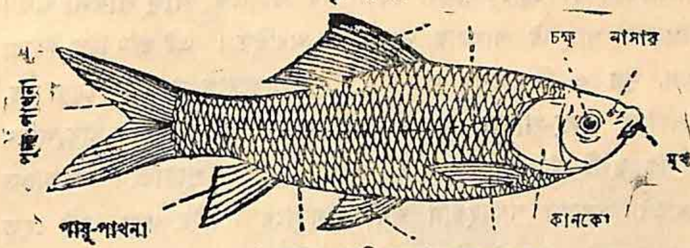
উদাহরণ সাহায্যে মাছের **বাহ্যিক** গঠনাদি ভাল করিয়া বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা এখানে **রুই** মাছের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব

রুই মাছ

রুই মাছের দেহ টর্পেডো বা পটলের মত দুই দিক সরু ও মাঝখানটা মোটা ও তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। ইহাদের পিঠের দিক অপেক্ষাকৃত কালো, পেটের দিক উজ্জ্বল সাদা।

সমগ্র দেহটি **আঁশ** দিয়া ঢাকা। ইহাদের মাথায় আঁশ নাই। ইহাদের মুখের হাঁ অপেক্ষাকৃত বড়; উপর ও নিম্ন-ওষ্ঠ বর্তমান। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থলের দুই ধারে অতি ক্ষুদ্র দুইটি শৃঙ্গের মতন নমনীয় গঠন আছে; উহা স্পর্শশক্তিসম্পন্ন। মাথার উপরে এবং মুখের পিছনে দুইটি ছিদ্র দেখা যায়, ইহাই **নাসারন্ধ্র**। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল নহে এবং

নাসারন্ধ্র শ্বাসক্রিয়ায় আদৌ ব্যবহৃত হয় না। চোখ দুইটি মাথার দুই পার্শ্বে অবস্থিত এবং চোখের কোন পাতা নাই; চোখের পিছনে ইহাদিগের **কানকো** থাকে। শ্বাসক্রিয়ার জন্য সর্বদাই উহা উঠা-নামা করে। কানকোর ভিতর দিকে প্রত্যেক পার্শ্বে চারিখানি করিয়া **ফুলকা** আছে; উহার দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালায়। এই সময়ে ইহারা মুখ দিয়া জল গ্রহণ করে



রুই মাছের বাহ্যিক গঠন

(নাসারন্ধ্র দিয়া নহে) এবং কানকোর পাশ দিয়া জল বাহির করিয়া দেয়। ইহাদের কোন চোয়ালেই দাঁত নাই। জলের মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাইয়া জীবনধারণ করে; রুই মাছের বাচ্চারা প্রথম অবস্থায় মশক-শিশু, জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু ও জীবাণু খাইয়া বড় হয়। দেহের মাঝখানে কানকো হইতে লেজ পর্যন্ত দুই পার্শ্বে দুইটি **পার্শ্বরেখা** আছে।

ইহাদের **পাখনা** দুই প্রকার—(১) যুগ্ম পাখনা ও (২) অযুগ্ম মাধ্যিক পাখনা।

(১) **যুগ্ম পাখনা**—দুইধারে একখানি করিয়া দুইখানি একই প্রকার পাখনা থাকিলে তাহাকে **যুগ্ম** পাখনা বলে। যুগ্ম পাখনা আবার দুই প্রকার। কানকোর পিছনে এবং বক্ষোদেশের দুই পার্শ্বে যে পাখনা দেখা যায়, তাহাকে **বক্ষ-পাখনা** বলে। সেইরূপ উদরদেশে বক্ষ-পাখনার পিছনে যে পাখনাদ্বয় দেখা যায় তাহাকে **শ্রোণি-পাখনা** বলে।

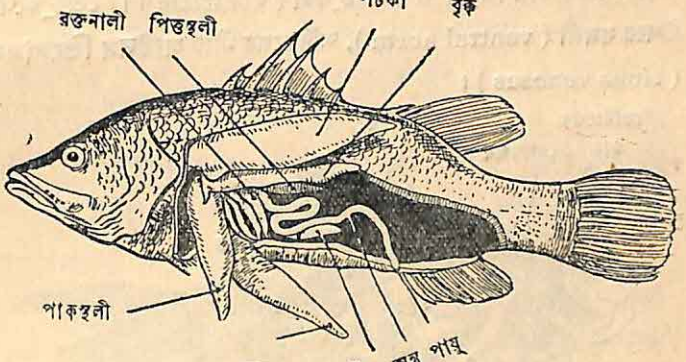
(২) **অযুগ্ম মাধ্যিক পাখনা**—এই প্রকার পাখনা একখানি করিয়া হয়। এইরূপ তিনখানি পাখনা দেহের উপরে, নিম্নে ও লেজে অবস্থিত।

দেহের মধ্যস্থানে পৃষ্ঠের উপর নৌকার পালের মত যে পাখনাখানি দেখা যায়, তাহাকে **পৃষ্ঠ-পাখনা** বলে। ঐরূপ পেটের দিকে লেজের নিকটবর্তী যে ছোট পাখনা দেখা যায় তাহাকে **পায়ু পাখনা** বলে। ইহাদের পায়ু ঐ পাখনার পুরোভাগে অবস্থিত। এই স্থান দিয়া ইহারা মল, মূত্র ও ডিম ত্যাগ করে। লেজের প্রান্তদেশে যে পাখনা দেখা যায়, তাহাকে **পুচ্ছ-পাখনা** বলে। রুই মাছের পুচ্ছ-পাখনা দ্বিশাখ অর্থাৎ ইহার দুইটি ফ্যাকড়া আছে। ইহাদের দেহের পুরোভাগ অপেক্ষাকৃত আড়ষ্ট। দেহের পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ লেজাংশ নমনীয় এবং সেই হেতু দেহের এই অংশ ইহাদিগকে সাঁতরাইতে সাহায্য করে। দেহ খাড়া রাখিবার জন্য অন্যান্য মাধ্যিক পাখনা বিস্তার করিয়া রাখে। যখন দ্রুত সাঁতরাইয়া যায়, তখন যুগ্ম পাখনাগুলি বিস্তার করিলে বাধা পাইবে বলিয়া দেহের সহিত লাগাইয়া রাখে। যুগ্ম পাখনাদ্বয় অর্থাৎ বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা মুখ্যতঃ উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হয়। ধীর গতিতে সাঁতরাইবার সময় দেখিতে পাইবে যুগ্ম পাখনাগুলি নৌকার দাঁড়ের মত ব্যবহার করে। আবার কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকিবার সময় উহারা ভারের সমতা রক্ষা করে। যুগ্ম পাখনাদ্বয় কাটিয়া দিলে, সাধারণতঃ উহারা উলটাইয়া যায় অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিক নিম্ন রাখে। এক পার্শ্বে যুগ্ম পাখনা কাটিয়া দিলে সেইদিকে শুইয়া পড়ে।

ভেটকি মাছের দেহ ঃ—ভেটকি মাছের দেহ, মুখ ও লেজের দিক অপেক্ষাকৃত সরু এবং দুইপাশে অপেক্ষাকৃত চাপা। ইহার একখানির বদলে **দুইখানিপৃষ্ঠ-পাখনা** ও **বৃত্তাকার পুচ্ছ-পাখনা** ছাড়া অন্যান্য পাখনা ও দেহের বাহিক অন্যান্য গঠন সবই প্রায় রুই মাছের মতন।

আভ্যন্তরিক গঠন (Internal Structure)

সব মাছেরই সাধারণতঃ আভ্যন্তরিক গঠনাদি (internal structures) সমান। আমরা এখানে ভেটকি মাছের আভ্যন্তরিক গঠনের বিবরণ দিব।

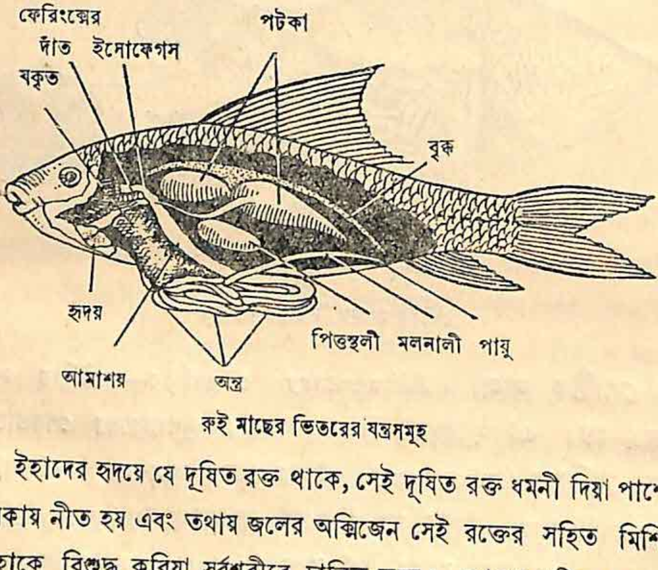


ভেটকি মাছের ভিতরের যন্ত্রসমূহ

পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal):—ভেটকির মুখগহ্বর বড়। এই মুখগহ্বরে জিহ্বা আছে। মুখগহ্বরের শেষভাগের নাম **ফেরিংক্স** (pharynx)। ইহার পরের অংশের নাম **গলনালী** (œsophagus), ইহার পর পাকস্থলী বা **আমাশয়** (stomach)। পাকস্থলীর একধার হইতে দীর্ঘ **অন্ত্র** (intestines) বাহির হইয়া **পায়ুতে** (anus) শেষ হইয়াছে। মুখবিবর হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ুতে যে নালী শেষ হইল, তাহার নাম **পৌষ্টিক নালী**। পাকস্থলীর দুইধারে লম্বা দুই **যকৃৎ** বা **মেটুলি** (liver) থাকে। অন্ত্র যে স্থল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইস্থলে পাঁচটি ছোট **পাইলরিক সিকা** বা

বদ্ধনালী (pyloric cœca) আছে। **রুই** মাছে ঐরূপ কোন বদ্ধনালী নাই। দুইটি যকৃতের মাঝে **পিত্তস্থলী** (gall bladder) অবস্থিত।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র (Circulatory system) :—পেট কাটিলে যে লাল যন্ত্র দেখা যায়, তাহার নাম **রক্তসঞ্চালন যন্ত্র** বা **হৃদয়** (heart)। এই হৃদয় দুই ভাগে বিভক্ত, নীচের ভাগ **অরিকল** (auricle) এবং উপরের ভাগ **নিলয়** বা **ভেণ্ট্রিকল** (ventricle)। ভেণ্ট্রিকলের উপরে **ধমনী** (ventral aorta), অরিকলের নীচে **সাইনস ভিনোসস** (sinus venosus)।



রুই মাছের ভিতরের যন্ত্রসমূহ

ইহাদের হৃদয়ে যে দূষিত রক্ত থাকে, সেই দূষিত রক্ত ধমনী দিয়া পাশের ফুলকায় নীত হয় এবং তথায় জলের অক্সিজেন সেই রক্তের সহিত মিশিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া সর্বশরীরে চালিত করে। আবার শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে দূষিত রক্ত শিরা দিয়া আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। শিরা ও ধমনীর সংযোগস্থলে **সূক্ষ্মজাল** (capillaries) আছে। হৃদয়ের অরিকলের ভিতরে এক **ভাল্‌ভ** বা **কপাটিকা** (valve) এবং ভেণ্ট্রিকলের ভিতর আর এক ভাল্‌ভ আছে। এই দুই ভাল্‌ভ সাহায্যে রক্ত একদিকে

চালিত হয়, হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পায় না। হৃদয় অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলে রক্ত সর্বাঙ্গে চলাচল করে। রক্তের তরল অংশের নাম **প্লাজমা** (plasma)। এই প্লাজমায় দুই প্রকার কঠিন কণিকা ভাসমান। এক প্রকার কণিকার রঙ লাল, ইহাকে লোহিতকণিকা (red corpuscle) বলে ; অপর প্রকার কণিকার রঙ সাদা, উহাকে শ্বেতকণিকা (white corpuscle) বলে।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system) :—শ্বাসকার্য ফুলকা দ্বারা সম্পাদিত হয়। কারণ মাছের সাধারণতঃ ফুসফুস (lungs) থাকে না। ইহাদের মাথার দুই পার্শ্বে কানকো (operculum) আছে। ঐ কানকো খুলিলে উহার ভিতর লাল ফুলকা দেখা যায়। বাঁকা চিরুণীর মত দুই পার্শ্বে ৪টি করিয়া ৮টি **ফুলকা** (gills) থাকে। ফুলকাগুলির মধ্যে অনেক রক্তনালী থাকায় তাহাদিগকে ঐরূপ লাল দেখায়।

শ্বাস-গ্রহণের সময় ইহারা মুখের মধ্যে খানিকটা জল টানিয়া লয়। ঐ জলে অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে। জল টানিবার সময় উহাদের কানকো দুইটি বন্ধ থাকে। তারপর উহারা মুখ ও গলা বন্ধ করিয়া মুখগহ্বরের তলদেশ উঁচু করে ; উহাতে মুখগহ্বরটি ছোট হইতে থাকে এবং ভিতরের জলে খুব চাপ পড়ে, ঐ চাপের ফলে ভিতরের অক্সিজেন-মিশ্রিত জল ফুলকার মধ্যে চলিয়া যায় এবং কানকোও তখন খুলিয়া যায়। তখন জলের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে, উহা ফুলকার ভিতরের রক্তনালীর দ্বারা শোষিত (absorbed) হয় এবং ঐ রক্তের দ্বারা অক্সিজেন সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং পূর্বের দূষিত রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলের সহিত মিলিত হইয়া কানকো দিয়া বাহির হইয়া যায়।

পটকা (Air-bladder) :—ভেটকি মাছের পটকা এক-কক্ষ-বিশিষ্ট (one-chambered)। রুই কাতলার পটকা দুই-কক্ষ-বিশিষ্ট (two-chambered)।

অস্থিতন্ত্র (Skeletal system):—মাছের মস্তক বা মুড়া অস্থি-নির্মিত। মানুষের খুলির সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে। মাছের পিঠে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। এই শিরদাঁড়া কতকগুলি কশেরুকা (vertebra) দ্বারা গঠিত। ইহা ছাড়া ইহাদের আরও কতকগুলি অস্থি থাকে।

রেচন তন্ত্র (Excretory system):—শিরদাঁড়ায় সম্মুখের দিকে দুইধারে দুইটি লম্বা চকলেট রঙের **বৃক্ক** (kidney) আছে। প্রত্যেক বৃক্কের শেষভাগ হইতে এক একটি পাতলা নল বাহির হইয়া অল্প দূরে সম্মিলিত হইয়া পায়ুতে উপস্থিত হয়। ঐ নলের মধ্য দিয়া প্রস্রাব পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

কুনো ব্যাঙ

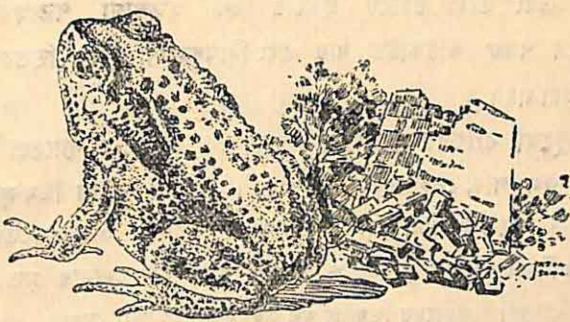
ব্যাঙ—উভয়চর শ্রেণীভুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী। উভয়চর এইজন্য বলা হয় যে, ইহারা জীবনের প্রথম অবস্থায় জলে ও পরে স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে এবং জলচর অবস্থায় ইহাদের মাছের ন্যায় ফুলকা থাকে ও স্থলচর অবস্থায় ইহাদের ফুস্‌ফুস্ থাকে। ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থাই হইল ইহাদের ব্যাঙাচি অবস্থা।

আমাদের দেশে নানা জাতির ব্যাঙ দেখা যায়। যে দুইটি ব্যাঙ আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তাহার একটিকে বলি **কোলা ব্যাঙ** বা **সোনা ব্যাঙ**, আর একটিকে বলি **খসখসে** বা **কুনো ব্যাঙ**। এখানে আমরা কুনো ব্যাঙ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাসস্থান—বৃক্ষকোটরে, মাটির নীচে, ঝোপে, ঝাড়ে, নানাস্থানে কুনো ব্যাঙ পাওয়া যায়।

দেহ—কুনো ব্যাঙের শরীরে দুইটি ভাগ দেখা যায়—**মস্তক** বা **মাথা** এবং **দেহকাণ্ড**। ইহাদের ঘাড় নাই, লেজও নাই। ইহাদের ত্বক্ মসৃণ ত

নয়ই, বরং খসখসে। উপরন্তু সর্বশরীর **আঁচিলের মত গুল্মে** ভরা। ইহাদের মুখ থ্যাব্‌ড়া ও চোখ দুইটি বড় বড়। চোখের উপর পাতা বড়,



কুনো ব্যাঙ

নীচের পাতা নাই বলিলেই হয়; তবে একটি তৃতীয় পাতলা পাতা আছে, তাহার দ্বারা চোখ ঢাকিয়া রাখে। চোখের পিছনে পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা যে গঠনটি দেখা যায়, তাহাকে **কর্ণপটহ** কহে। ইহাদের কর্ণপটহের পিছনে শিমের বিচির মত দুইটি গঠন দেখা যায় উহাকে **প্যারটিড গ্রন্থি** বলে। ইহা হইতে ইহারা প্রচুর বিষাক্ত রস নির্গত করিতে পারে এবং পিচকারির মত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। মস্তকাগ্রে দুইটি নাসারন্ধ্র আছে। ইহাদের সামনের পা ছোট এবং তাহাতে **চারিটি** করিয়া অঙ্গুলি আছে। পিছনের পায়ে **পাঁচটি** করিয়া অঙ্গুলি আছে। ইহাদের পিছনের পা সম্মুখের পা হইতে বেশী বড় নহে। ইহারা খুব বেশী লাফাইতেও পারে না। থপ্‌ থপ্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।



জিহ্বা দ্বারা পোকা ধরিবার প্রণালী

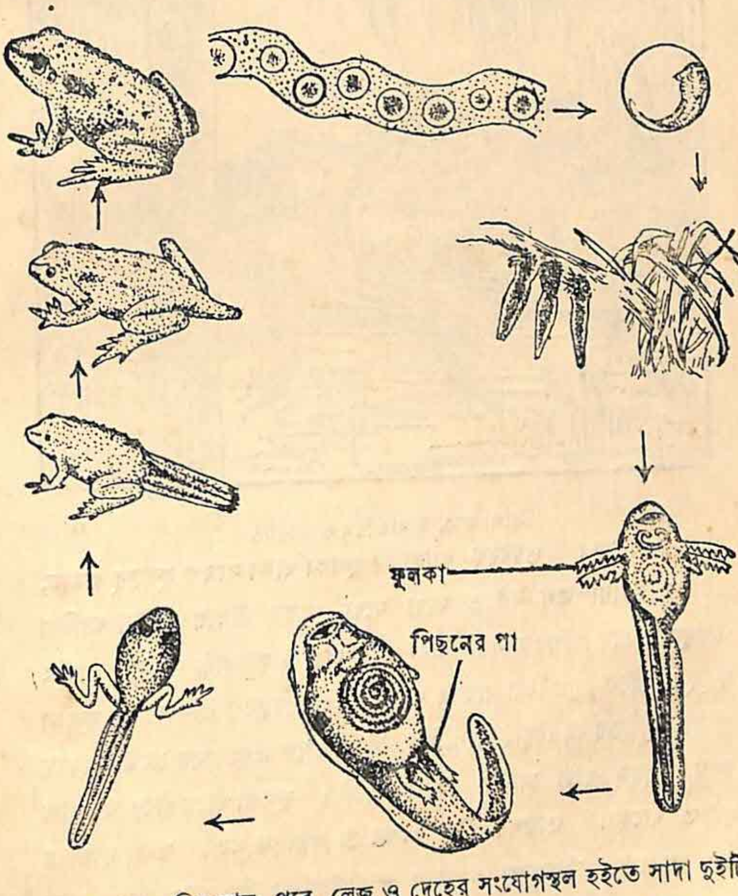
ব্যাঙের খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ প্রণালী— ব্যাঙেরা পোকা-মাকড়, কেঁচো ইত্যাদি ধরিয়া খায়। ব্যাঙের জিহ্বা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের জিহ্বা যেমন

পিছনে আটকানো থাকে, ব্যাঙের তেমনি সম্মুখে লগ্ন থাকে, উহারা জিহ্বা দ্বারা পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়। জিহ্বা উলটাইয়া বাহির করিয়া দেয় এবং তাহা চটচটে হওয়ার দরুন হতভাগ্য পতঙ্গের গায়ে পড়িলে পতঙ্গ আটকাইয়া যায় এবং নিমেষমধ্যে মুখের ভিতর শিকার ঢুকাইয়া লয়।

কুনো ব্যাঙের রূপান্তর—বর্ষাকালে স্ত্রী-কুনো ব্যাঙেরা যেখানে একটু জল পায়, সেইখানেই ডিম পাড়ে। কুনো ব্যাঙের ডিম **সূত্রাকার** এবং তাহাতেও সাদা জেলির মত পদার্থ থাকে। একটি সুতোর মতন নলের ভিতর, অর্ধেক কালো ও অর্ধেক সাদা মটর দানার মত অসংখ্য ডিম থাকে। ইহাদের ডিম্বনল খুব লম্বা দড়ির মতন দেখায় এবং জলজ গাছপালার গায়ে আটকানো থাকে। ডিমগুলি জল পাইয়া বেশ ফুলিয়া উঠে এবং জলে ভাসে। কয়েকদিন পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ইহারাই ব্যাঙের **লার্ভা**, অর্থাৎ **ব্যাঙাচি**। ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থায় মাথা ও লেজ থাকে, তাহার সাহায্যে ইহারা জলের মধ্যে পাতায় সংলগ্ন থাকে। এই অবস্থায় মাথার দুই পার্শ্বে ফুলকা বাহিরে ঝুলিতে থাকে এবং মাছের মত ফুলকার দ্বারা জলের মধ্যে শ্বাসক্রিয়া চালাইতে থাকে। ইহারা মুখ খুলে না এবং কিছু খায় না, কারণ ইহাদের দেহভ্যন্তরে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা খাইয়া বর্ধিত হয়, এবং লেজের সাহায্যে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। ক্রমে ব্যাঙাচির ফুলকা, চর্মাবৃত হইয়া দেহের ভিতরে চলিয়া যায় এবং দেহপার্শ্বে এক একটি ছিদ্র রাখিয়া যায়, তাহার মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া যায়। মুখের উপর-নীচে ওষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে সারি সারি চিরুনির কাঁটার মতন দাঁত থাকে ; তাহার দ্বারা পাতার গায়ে সংলগ্ন শেওলা বা জলজ জীব ইত্যাদি কুরিয়া কুরিয়া খায় ; আভ্যন্তরীণ ফুলকার দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। কুনো ব্যাঙের ব্যাঙাচির লেজ লম্বা হয় না, ইহার শেষভাগ গোলাকার। ইহার সর্বশরীর

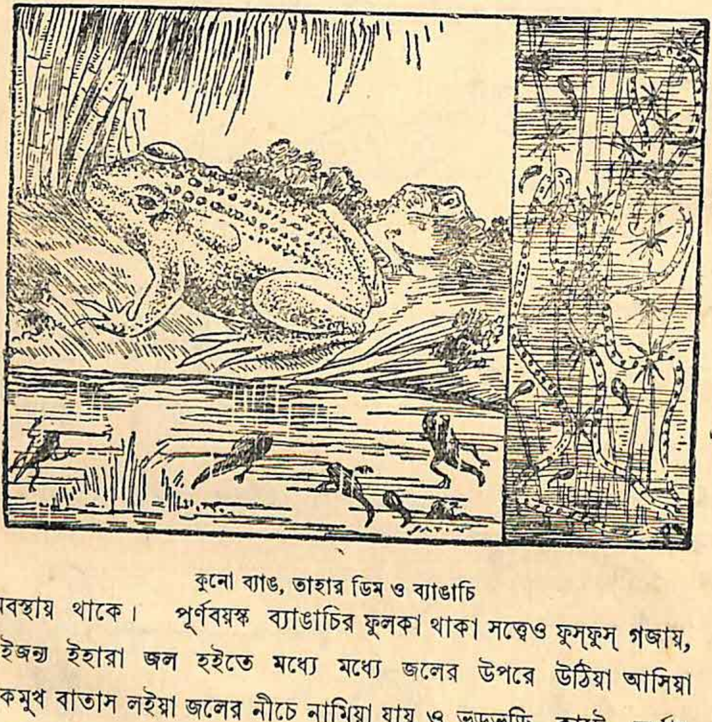
কালো। এই অবস্থায় ইহারা প্রায় সম্পূর্ণই মাছের মত লেজের দ্বারা সাঁতরাইয়া বেড়ায় এবং ফুলকার দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়।

কুনো ব্যাঙের রূপান্তর



আরও কিছুকাল পরে লেজ ও দেহের সংযোগস্থল হইতে সাদা দুইটি **গুল্ম** বাহির হয়—ক্রমে ক্রমে ইহা ব্যাঙের পিছনের পায়ে পরিণত হয়।

ইহাদের সামনের পা বাহিরে দেখা যায় না বটে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরে একই সময়ে উৎপত্তি লাভ করে। ফুলকার আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে বলিয়া আমরা ইহা দেখিতে পাই না। আবরণের মধ্যে পা দুইখানি ভাঁজকরা



কুনো ব্যাঙ, তাহার ডিম ও ব্যাঙাচি

অবস্থায় থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙাচির ফুলকা থাকা সত্ত্বেও ফুসফুস্ গজায়, এইজন্য ইহারা জল হইতে মধ্যে মধ্যে জলের উপরে উঠিয়া আসিয়া একমুখ বাতাস লইয়া জলের নীচে নামিয়া যায় ও ভুড়ভুড়ি কাটে, অর্থাৎ ফুসফুস্ হইতে মুখ দিয়া বাতাস বাহির করিয়া দেয়। এই অবস্থায় ফুলকা ও ফুসফুস্ উভয় যন্ত্র দিয়াই শাসক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ফুলকার কাজ ফুসফুস্ দ্বারা চালিত হইতে থাকে। ফুলকা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। তারপর উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। তখন ফুলকার আবরণে ঢাকা ভাঁজকরা সামনের পা দু'খানি বাহির হইয়া আসে, আর ব্যাঙাচি সম্পূর্ণরূপে বায়ুগ্রহণকারী প্রাণী হইয়া চার পায়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ইহারা পাড়ে আসিয়া চার পায়ে দাঁড়াইয়া শ্বাসকার্য চালায়।

মশা ও মাছি

মশা ও মাছি সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে প্রথমে পতঙ্গ সম্বন্ধে দুইচারি কথা জানা প্রয়োজন, কারণ মশা ও মাছি উভয়ই পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পৃথিবীতে যেমন তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল, তেমনি প্রাণিজগতের তিন ভাগ পতঙ্গ ও এক ভাগ অন্যান্য প্রাণী।

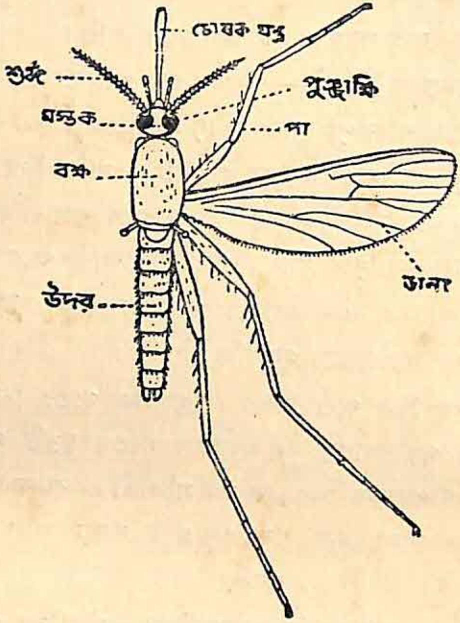
পতঙ্গের দেহের বৈশিষ্ট্য—পতঙ্গের দেহ প্রধানতঃ তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। (পরের পৃষ্ঠার ছবি দেখ) সম্মুখদিকে **মস্তক** বা **মাথা**, মধ্যে **বক্ষ** বা **বুক** এবং সর্বশেষে **উদর** বা **পেট**। মাথার উপরে দুইধারে সরু নরম কাঠির মত নমনীয় দুইটি যন্ত্র আছে, তাহাকে **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** বলে। শুঙ্গ সাধারণতঃ খুব ছোট ছোট রোমে আবৃত থাকে। মাথার দুইপার্শ্বে চোখ থাকে। এক একটি চোখের মধ্যে আবার হাজার হাজার চোখ, সেইজন্য পতঙ্গের চোখকে **পুঞ্জাক্ষি** বলা হয়।

বক্ষ বা বুক তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডের নিম্নদেশে এক জোড়া করিয়া **পা** আছে, অর্থাৎ ইহার সর্বসুদ্ধ **ছয়টি পা**। এই বিশিষ্টতার জন্য পতঙ্গের আর এক নাম **ষট্‌পদী**। বুকের উপর দিকে পতঙ্গের পক্ষ বা **ডানা** থাকে। সব পতঙ্গেরই যে ডানা আছে তাহা নয়।

মশা

মশার দেহ—মশার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। মশার মাথা গোলাকার, মাথার দুই ধারে দুইটি **পুঞ্জাক্ষি**। সম্মুখে সরু কাঠির মত রোমাবৃত **শুঙ্গ** বা **শুঁড়**। শুঙ্গ দেখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ-মশা চেনা যায়। **পুরুষ মশার** শুঙ্গে বড় বড় রোম থাকায় একটা ঝাড়ের মতন দেখায়। রস বা রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য মুখে অনেকটা **চোঙের** মত দেখিতে এক যন্ত্র আছে। এই চোঙ বিঁধিয়া ইহারা রস বা রক্ত পান করিয়া থাকে। পুং-মশা মানুষের গায়ে চোঙ ফুটাইতে পারে না এবং রক্তও খায় না। সাধারণতঃ তাহারা গাছের রস খাইয়া জীবন কাটায়।

স্ত্রী-মশাই সকল অনিষ্টের মূল, তাহারাই মানুষ বা পশুর রক্ত ঐ চোঙ ফুটাইয়া চুষিয়া খায়।



পতংগের (মশার) বহিরবয়ব

ইহাদের বুক কুব্জাকার এবং **তিন খণ্ডে** বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে এক জোড়া করিয়া সরু কাঠির মত মোট তিন জোড়া বা ছয়টা কালো **লম্বা পা** থাকে। মধ্য খণ্ডে এক জোড়া স্বচ্ছ পাতলা **ডানা**। মশারা যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, তাহা উড়িবার সময় ডানার দ্রুত কম্পনে উৎপন্ন হয়, আবার যখন তাহারা ডানার কম্পন থামাইয়া বাতাসে ভাসিতে থাকে, তখন শব্দ বন্ধ হইয়া যায়।

ইহাদের পেট লম্বা এবং সরু ও নয় খণ্ডে বিভক্ত। উদর ও বক্ষের প্রত্যেক খণ্ডের পার্শ্বদেশে **শ্বাস-ছিদ্র** অবস্থিত।

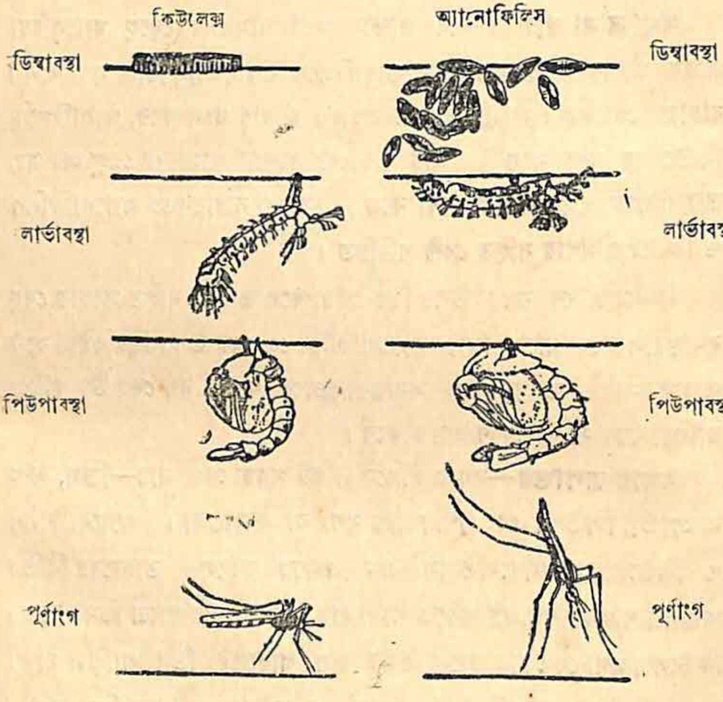
মশার প্রকৃতি ও বাসস্থান—মশা সাধারণতঃ দিনে বাহির হয় না। অন্ধকার স্থানে থাকিতে ভালবাসে। এক কথায়, ইহারা নিশাচর। আলো ও বাতাস ইহারা একটুও সহ্য করিতে পারে না এবং একটুও ভালবাসে না। ইহারা আমাদের দেহে নানারকমের রোগজীবাণু সংক্রামিত করে।

মশা নানা জাতীয়—যে জাতীয় মশা আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু সংক্রামিত করে, তাহাদিগকে **অ্যানোফিলিস** মশা বলে। যাহারা গোদের (ফাইলেরিয়া রোগের) জীবাণু বহন করে, তাহাদিগকে **কিউলেক্স** মশা বলে। আর যাহাদের দংশনে আমাদের ডেঙ্গু জ্বর হয়, তাহাদিগকে **ষ্টেগোমায়া** মশা বলে। আমরা সাধারণতঃ অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার সহিত বেশী পরিচিত।

কিউলেক্স যে বস্তুর উপর স্থির হইয়া বসে তাহার সহিত তাহার দেহ সমান্তরালভাবে থাকে কিন্তু অ্যানোফিলিস যে বস্তুর উপর স্থির হইয়া বসে তাহার সহিত তাহার দেহ সমান্তরালভাবে থাকে না, দেহ উঁচু করিয়া রাখিয়া বস্তুর সহিত কোণ প্রস্তুত করে।

মশার রূপান্তর—মশার জীবনে চারিটি অবস্থা দেখা যায়—**ডিম, শূক বা লার্ভা, পিউপা** এবং পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত মশা বা **ইমাগো**। অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্সের জীবনেতিহাস এক প্রকার হইলেও তাহাদের বিভিন্ন অবস্থার পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারা যায়। মশা ভোর রাত্রে ডিম পাড়ে। কিউলেক্স মশা যে কোন স্থানে একটু জল পাইলেই ডিম পাড়িয়া যায়। অ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার বড় পুকুর বা নদীতে সচরাচর ডিম পাড়ে। কিউলেক্সের ডিম গায়ে গায়ে লাগিয়া জলে ভাসে, অ্যানোফিলিসের ডিম ছাড়া ছাড়া। একসঙ্গে ২০০-৪০০ ডিম দেখা যায়। ডিম ফুটিয়া অনেকটা কৃমির মত শূক বা লার্ভা বাহির হয়। ইহাদের শরীরের পার্শ্বে লম্বা লম্বা রোম থাকে। ইহাদের চক্ষু আছে কিন্তু পা নাই। ইহারা জলের মধ্যে খেলিয়া বেড়ায় ও জলের মধ্যে জীবাণু খাইয়া বড় হয়। ইহাদের শ্বাস যন্ত্র

এমন যে জলের উপর হইতে বাতাস লইতে পারে। কিউলেক্স লার্ভার নলাকার শ্বাসযন্ত্র পেটের শেষ দিকে থাকে, অ্যানোফিলিস লার্ভার উহা নাই। শ্বাসক্রিয়ার সময় অ্যানোফিলিস লার্ভা জলের লাইনের সমান্তরালে অবস্থান করে, কিন্তু কিউলেক্সের লার্ভা মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলিতে থাকে এবং শ্বাসযন্ত্র দুইটি জলের লাইন হইতে একটু জাগিয়া থাকে।



মশার রূপান্তর

৭ হইতে ১০ দিন লার্ভা অবস্থা কাটাইবার পর দেহের প্রচুর পরিবর্তন হয় এবং **পিউপা** অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মশকের পিউপা, লার্ভার মত সদাই সক্রিয়। কিন্তু পিউপা অভুক্ত থাকে। পিউপাদের দেহটা মনে হয় যেন, বাঁকা বঁড়শির মত। এই অবস্থায় কিউলেক্স পিউপার শ্বাসযন্ত্র উদরের

শেষভাগ হইতে সরিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে আসে। অ্যানোফিলিস পিউপার শ্বাসযন্ত্র নূতন করিয়া জন্মায়। এক হইতে তিন দিন এইরূপ অবস্থা কাটাইবার পর জলের উপরের সীমানায় পৌঁছে। সেই স্থানে দুই-তিন বার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাংগ মশা বাহির হইয়া আসে।

মাছি

মাছি, মশার মতন অমেরুদণ্ডী পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। ইহাদের অত্যাচারে সকলকেই ভুগিতে হয়। পূর্ণাংগ মাছি প্রায় সিকি (¼) ইঞ্চি লম্বা হয় ও দেখিতে ধূসর বর্ণের।



মাছির দেহ

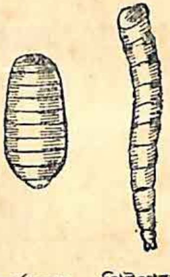
মাছির দেহ—অন্যান্য পতঙ্গের মত মাছির দেহও তিনভাগে বিভক্ত—**মাথা**, **বুক** ও **পেট**। মাথার দুই পার্শ্বে দুইটি বড় বড় **পুঞ্জাক্ষি** আছে। মাথার সামনে এক জোড়া ছোট শুঙ্গ থাকে। মাছির মুখটা মাথার নীচের দিকে। রস চুষিয়া খাইবার জন্য মাছির মুখ হইতে একটা লম্বা চোঙ্গের মত যন্ত্র বাহির হয়। অন্য সময়ে উহা মাথার মধ্যে গুটাইয়া রাখে। ঐ চোঙ দিয়া মাছি কামড়াইতে পারে না, কেবল রস চুষিতে পারে।

বুক তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডের নীচ হইতে এক জোড়া করিয়া মোট তিন জোড়া রোমাবৃত সরু সরু পা থাকে। বুকের উপর এক জোড়া 'ডানা' থাকে। ইহাদের বুকের উপর চারিটা কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পেটের মাঝখানটি মোটা ও পিছনের দিকটা কোণাকৃতি। মশার মত ইহাদেরও পেট ও বুকের পার্শ্বে দুই সারি ছোট ছোট শ্বাস-ছিদ্র আছে।

মাছির রূপান্তর—ইহাদের জীবনেও চারিটি অবস্থা দেখা যায়—(১) ডিম অবস্থা; (২) শূক বা লার্ভা বা ম্যাগট অবস্থা; (৩) মূককীট বা ক্রাইসেলিস বা পিউপা অবস্থা ও (৪) পূর্ণাংগ অবস্থা।

স্ত্রী মাছি পচা, গলা, নোংরা জিনিসের উপর এমনকি মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর 'মল' এর উপর একসঙ্গে ১২০ থেকে ৫০০ ডিম পাড়ে। ৮ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ডিম হইতে খুব ছোট ছোট কৃমির ন্যায় শূককীট বাহির হয়। ইহারা ঐ পচা গলা ও নোংরা জিনিস খাইয়া বেশ বাড়িতে থাকে ও কিল্‌বিল করিয়া উহাতে বেড়ায়। ইহারা আলো সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য ঐ নোংরা পচা জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়া থাকে ও রাত্রে বাহির হয়। ৪।৫ দিন পরে লম্বা শূককীটের আকৃতি আস্তে আস্তে বদলাইতে বদলাইতে গোলাকার হইয়া একটা ছোট ফিকে হলদে পিপের মত গুটির ভিতর প্রবেশ ক'রে—এই অবস্থাকে ক্রাইসেলিস বা মূককীট অবস্থা বলে। এই গুটির ভিতর ইহাদের দেহের আরও পরিবর্তন হয় এবং ৫ হইতে ৭ দিনের পর ঐ গুটি কাটিয়া পূর্ণাংগ মাছি বাহির হয়।



লার্ভাবস্থা পিউপাবস্থ

মাছির স্বভাব ও **প্রকৃতি**—মাছি প্রায় সব স্থানেই থাকে। দিনের আলোতে ইহারা বাহির হয়। পচা জিনিস, মল-মূত্র, মরা জন্তু জানোয়ার থুথু, কফ, বমি প্রভৃতি যত নোংরা জিনিসের উপর ইহারা থাকিতে ভালবাসে এবং ঐ সমস্ত জিনিস হইতে মাছি রসও খায়। ইহাদের ঘ্রাণ-শক্তি খুব প্রবল।

মানুষের বোধ হয় সবচেয়ে বড় শত্রু মাছি। ইহারা নানা রকমের মারাত্মক রোগ মানুষের মধ্যে ছাড়ায়।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। বায়ুর উপাদান কি কি ? আয়তন হিসাবে উহারা বায়ুতে কি ভাবে মিশিয়া আছে ?

২। পরীক্ষাদ্বারা দেখাও যে বায়ুতে $\frac{৪}{৫}$ অংশ নাইট্রোজেন এবং $\frac{১}{৫}$ অংশ অক্সিজেন আছে।

৩। বায়ুতে নিম্নলিখিত পদার্থগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ কর—

(ক) নাইট্রোজেন, (খ) অক্সিজেন, (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও (ঘ) জলীয় বাষ্প।

৪। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন কিরূপে প্রস্তুত করিবে ? উহার ধর্ম ও পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৫। বায়ুর ওজন আছে উহা কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

৬। নিম্নলিখিত গুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—

(ক) সাধারণ পাম্প, (খ) পিচকারী ও (গ) প্রেষক পাম্প।

৭। সরল চাপমান যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার লিখ।

"চাপমান যন্ত্রে পারদস্তম্ভ দ্রুত নামিয়া আসিলে ঝড় বৃষ্টি যে আসন্ন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই করা সম্ভব", ইহার তাৎপর্য লিখ।

৮। বায়ুর গঠনের পরিবর্তন হয় কেন ? উহার সমতা কিরূপে রক্ষিত হয় ?

৯। উন্দমান যন্ত্র কাহাকে বলে ? চুলদ্বারা নির্মিত উন্দমান যন্ত্র বর্ণনা কর।

১০। বায়ুর প্লবতা সম্বন্ধে যাহা জান পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১১। দহন, শ্বাস কার্য ও মরিচা ধরার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বুঝাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। "আয়তন হিসাবে জলের উপাদানে আছে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন", পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

২। পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুত প্রণালী, তাহার ধর্ম ও ব্যবহার লিখ।

৩। "পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন আকৃতির পাত্রের কোন একটিতে জল ঢালিলে উহার উপরিভাগ এক সমতলে থাকিবে", পরীক্ষাদ্বারা উক্তিটির তাৎপর্য লিখ।

৪। "জল সর্বদিকে চাপ দেয়", পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫। কি কি উপায়ে জল দূষিত হয় ? পানের জন্য জল বিশুদ্ধ করিয়া কিরূপে শহরে সরবরাহ করা হয় ?

৬। আয়তন, ভর, ভার, ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। জলের প্লবতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। আর্কিমিডিসের সূত্র লিখ ও পরীক্ষাদ্বারা উহার সত্যতা প্রমাণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। তাপের উৎস সমূহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। উদাহরণ সাহায্যে কঠিন বস্তুর উপর তাপের প্রভাব বর্ণনা কর। প্রতিবিহিত দোলক কাহাকে বলে? চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৩। তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া বর্ণনা কর। বাষ্পীভবন কি? মাটির কলসীতে জল রাখিলে জল ঠাণ্ডা হয় কেন?

৪। ন্যাপথলিনের দ্রবণাঙ্ক নিরূপণ করিবার উপায় কি?

৫। কয় প্রকারে তাপের চলাচল হইয়া থাকে? ইঞ্জেন হাউসের পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৬। মেরু অঞ্চলের নিকটস্থ নদী, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইয়া গেলেও মৎস্যাদি জলচর জন্তুর প্রাণ-ধারণের কোন অসুবিধা হয় না কেন?

৭। তাপের বিকিরণ কিরূপে হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। চিত্রের সাহায্যে থার্মোফ্লাস্কের গঠন ও উহার ব্যবহার বর্ণনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। নিম্নলিখিত ধাতুগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—

তামা, অ্যালুমিনিয়ম, লৌহ, দস্তা, সীসা, পারদ, টিন, রূপা ও স্বর্ণ।

সংকর ধাতু কাহাকে বলে? পিতল ও কাঁসার নির্মাণ ও উহাদের ব্যবহার লিখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদ ভাবে লিখ।

২। চিত্রের সাহায্যে মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখাও ও তাহাদের কার্য বর্ণনা কর।

৩। মটর বীজ ও তাহার অঙ্কুরণ সম্বন্ধে যাহা জান বর্ণনা কর।

৪। ফুলের পরাগ সংযোগ বলিতে কি বুঝ? কয় প্রকারে ফুলের পরাগ সংযোগ হইয়া থাকে উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। বীজ ও ফলের উৎপত্তি কিরূপে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৫। বীজ ও ফলের বিস্তার কিরূপে হইয়া থাকে?

৬। কেঁচোর দেহ বর্ণনা কর। কেঁচো মানুষের কি উপকারে আইসে?

৭। রুই মাছের বহিরাবরণ ও ভেটকি মাছের আভ্যন্তরিক গঠন বর্ণনা কর।

৮। কুনো ব্যাঙের দেহ ও তাহার খাদ্য গ্রহণ প্রণালী বর্ণনা কর। কুনো ব্যাঙের রূপান্তর কিরূপে হয়?

৯। মশার দেহ ও তাহার রূপান্তর সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। মাছির রূপান্তর বর্ণনা কর।